প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা ১৩৬৭

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ হইতে শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত
ও শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথ
জীবন ও সাহিত্য

শুদ্ধিপত্র

পৃ. ৫৬	পং ১১	"প্রতিষ্টা" স্থলে "প্রতিষ্ঠা"
পৃ. ১০৫	„ ২	"পঞ্চম ও ষষ্ঠ" স্থলে "চতুর্থ ও পঞ্চম"
পৃ. ১০৯	„ ২৪	"প্রথম চৌধুরী" স্থলে "প্রমথ চৌধুরী"

যে বাঙালী মনীষী বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথকে (জন্ম : ৭ই মে ১৮৬১)
সর্বপ্রথম "বিশ্বকবি" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন সেই
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (জন্ম : ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)
স্মরণে এই গ্রন্থ নিবেদিত হইল।

ভূমিকা

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে, ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ সোমবার, ইংরেজী পঞ্জিকামতে মঙ্গলবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, রাত্রি আড়াইটা হইতে তিনটার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা "প্রিন্স"-আখ্যাত দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র "মহর্ষি"-খ্যাত দেবেন্দ্রনাথ এবং মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশতম সন্তান। আর এক বৎসর পরে এই ২৫শে বৈশাখ তারিখে তাঁহার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হইবে। বাংলা দেশ এবং বাঙালী জাতির ইতিহাসে আজিকার দিনটি একটি বিশেষ শুভদিন। যে অল্পসংখ্যক মহাপুরুষ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের একজন এবং আমাদের সৌভাগ্য এই যে তিনি আমাদের কাল পর্যন্ত সগৌরবে বর্তমান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি—স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা, সুতরাং ঋষি। কবি এবং ঋষিদের পরিচয় তাঁহাদের বাণীমুখেই এক যুগ হইতে অন্য যুগে প্রচারিত হয়; ইহার জন্য তাঁহাদের কাব্য এবং বাণী ছাড়া অন্য আয়োজনের আবশ্যক করে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাদের নিত্যসঙ্গী; আমরা সুদিনে-দুর্দিনে দুঃখে-সুখে বিলাসে-বৈরাগ্যে তাঁহার কবিতা স্মরণ অথবা আবৃত্তি করিয়া মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করি, সংসারের কণ্টকময় সঙ্কটপথে তাঁহার গান আমাদের আশা ও আশ্বাস দেয়। আমরা মনে মনে তাঁহার বাণীমূর্তি ধ্যান করি। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ইহাই হইতেছে সকলের চাইতে বড় খবর। তিনি কাহাদের ঘরে কবে জন্মিয়াছিলেন, এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়াছিলেন কি না, সাঁতার জানিতেন কি না, মাংস খাইতে ভালবাসিতেন কি না—এই সব বার্তা কবি-জীবনের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। আমাদের দেশের বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, চণ্ডীদাসের শুধু নামটুকু ছাড়া এই জাতীয় কোনও পরিচয় নাই, ইংলণ্ডের শেক্সপীয়রেরও সমান দুরবস্থা। মনে হয়, ইহারা ইচ্ছা করিয়াই স্ব স্ব সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিবার জন্য নিজেদের পার্থিব পরিচয়টুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে একান্ত অনাবশ্যক ও নশ্বর যে সব সংবাদ, ভক্তদের নজর পাছে সেদিকে আকৃষ্ট হয়

এই ভয় তাঁহাদের ছিল। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা যেমন আক্ষেপ করিয়াছিল, হায় হায়, আমার এই ধার-করা দেহরূপ আমাকেই অতিক্রম করিয়া গেল,—পৃথিবীর এই সব স্মরণীয় কবিরা সে আক্ষেপের অবকাশই রাখেন নাই।

সেদিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাগ্য মানিয়া লইতে হইবে। তিনি যে-কালেই জন্মিয়া থাকুন, আমাদের কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছেন; তাঁহার চরম প্রতিষ্ঠা—গ্রামোফোন ফোটোগ্রাফি রেডিও সিনেমার যুগে। সুতরাং তাঁহার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অসংখ্য টুকরা-টুকরা পরিচয় প্রত্যহ আমাদের চোখে দেখিতে অথবা কানে শুনিতে হইয়াছে. প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে নানা বাজে খবর। তাঁহার হাতের লেখা এবং কণ্ঠের ভঙ্গি পর্যন্ত জাল হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার এত বেশী পরিচয় আমরা প্রতিদিন পাইতেছি যে ভয় হয় তাঁহার নকল বহুরূপের মধ্যে আসল কবিরূপটাই না লোপ পাইয়া যায়। ইহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ আলমারির তাকে সাজাইয়া রাখা ফ্যাশনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে—তাঁহার কাব্যপাঠ এখন আউট-অব-ফ্যাশন। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার দীপ্তি এখনও আকাশমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত থাকিতে থাকিতে তাঁহার কাব্যের প্রতি অনাদর খুবই দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথের personality বা ব্যক্তিত্ব এত বড় যে তাঁহার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যই ভক্তদের খুশী রাখিত—কাব্যমহিমার মধ্যে কবিকে সন্ধান করার প্রয়োজন অনেকেই অনুভব করিতেন না। তিরোভাবের পর কবির নামে জয়ধ্বনি যতই উচ্চতর হইতেছে, কবির কাব্যের প্রতি আকর্ষণ ততই পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

এই কারণে, সন তারিখ আর ঘটনা সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের জীবন আমাদের কাছে ততখানি প্রয়োজনীয় নয় যতখানি প্রয়োজনীয় তাঁহার কাব্যজীবন। তিনি এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন এবং বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করিয়া কাব্য-সাধনা করিয়াছেন—এবং সে সাধনা সর্বত্র স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এখন শুধু বাংলাদেশের লোকপ্রিয় কবি মাত্র নন, আজ তিনি সমগ্র বিশ্বের বরণীয় কবি। জীবনী হিসাবে কবির এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট।

এই পরিচয়কে আর একটু বাড়ানো যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একটি বৃহৎ পারিবারিক গোষ্ঠীতে শৈশবে প্রায় নিঃসঙ্গ একক জীবন যাপন করিয়াছিলেন; কাজেই নিজের মনের সঙ্গে খেলা করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে

থাকিতে হইত চাকরবাকরদের খবরদারির মধ্যে। তিনি নিজে 'জীবন-স্মৃতি'তে স্বীকার করিয়াছেন, ভৃত্যরাজতন্ত্রের প্রজা হইয়া বাহিরে যাইবার হুকুম ছিল না, অন্তঃপুরের কয়েদঘর হইতে তিনি ডিঙি মারিয়া গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখিতেন—চিৎপুরের চৌহদ্দির মধ্যে প্রকৃতির সে রূপও মনোহর ছিল না। বাগানের একটি বিপুলকায় বটগাছ এবং একটি এঁদো ডোবার অবকাশপথে তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মন ছুটিয়া যাইত সুদূর দিগন্তে "যেখানে আকাশের নীলিমা—তাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য"। সেকালের বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থাও তিনি খুশী মনে মানিয়া লইতে পারেন নাই—তিনি নিজের খেয়ালমত বই পড়িতেন এবং নিজের সাধ্যমত অধীত বিষয়ের মর্মগ্রহণ করিতেন। তাহা যে সর্বদা ব্যাকরণ অভিধান সঙ্গত হইত তাহা নয়। এই আত্মকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গ অবস্থা হইতে হঠাৎ তাঁহার বারো বৎসর বয়সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উন্মুক্ত উদার এবং গম্ভীর বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দেন—অন্তঃপুরে অন্তরীণ বালক একেবারে অভ্রচুম্বী হিমালয়ের মুখামুখি দণ্ডায়মান হন। স্কুলের পাঠ তখন মধ্যপথে খণ্ডিত, পিতার কাছে তিনি সংস্কৃত-ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও উপনিষদের পাঠ লইতেছেন। শৈশব এইভাবেই শেষ হয়।

কিন্তু শৈশব শেষ হইবার আগেই শুরু হইয়াছিল কাব্য-সাধনা। মনের সঙ্গে খেলিতে খেলিতে তিনি অবিশ্রাম "ছন্দের ঘর" বানাইতে ভালবাসিতেন, এই খেলায় তিনি এক অদ্ভুত আনন্দ পাইতেন। অনেকদিন পরে সেদিনের এই বিচিত্র খেলা সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন—

"আমার সুদীর্ঘ কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই, সেই তাৎপর্যটি কি, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি; তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের

প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম :—

এ কি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ি !
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কৈ ?
অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সংগীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে !"

['বঙ্গভাষার লেখক,' পৃ. ৯৬৪-৬৫]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে এই কৌতুকময়ীই তাঁহাকে ইঙ্গিতে-ইশারায় পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মর্ত-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার কৌতুকের খেলার শেষ হয় নাই। কবি রবীন্দ্রনাথকে জানিতে হইলে এই কৌতুকময়ীকেই জানিতে হইবে। তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন রবীন্দ্রনাথের সহস্রধার কাব্যপ্রবাহিণীর মধ্যে, কখনও একরূপে কখনও অন্যরূপে, কখনও রুদ্রভীষণ, কখনও মোহনসুন্দর মূর্তিতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারায় অবগাহন স্নান না করিলে এই কৌতুকময়ীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এই কৌতুকের খেলায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিস্ময় অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

"আশ্চর্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি। আমার মধ্যে কি অনন্ত মাধুর্য আছে,—যে জন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকার সমস্ত শক্তিদ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে, আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমাকে কেহ ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে আমি আমার এই আশ্চর্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ

অশ্রান্ত রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোন শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না?

আপনি বরিয়া লইয়াছ মোরে
না জানি কিসের আশে!
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে?
বরষা শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে?
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবনবনে?
কি দেখিছ বঁধু মরম-মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি?
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া,
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,

সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি !"
['বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৯৭৩-৭৪]

সেই কৌতুকময়ী কাব্যদেবতা কি ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন-দেবতা হইয়া উঠিল ইহাই তাহার আশ্চর্য ইতিহাস। কবির সম্পূর্ণ অগোচরে দুই এক হইয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে কবির নিজের সাক্ষ্য সব চাইতে মূল্যবান। একটি ছোট পত্রে রবীন্দ্র-জীবনের মর্মকথা অতি নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। আজিকার দিনে সেদিনের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যদি আমরা বুঝিতে পারি তাহা হইলে তাঁহার সারা জীবনের কাব্যসাধনা এবং কর্মসাধনা আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমরা দেখিতে পাইব, কবি, কর্মী, শিক্ষক, শিল্পী এবং গুরু রবীন্দ্রনাথ একই মূল ভাবধারাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিবার চেষ্টাই আজীবন করিয়া আসিয়াছেন—সেই ভাবধারাকেই কবি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বলিতে পারি। তিনি এই চিঠিতে বলিয়াছেন, "ঠিক যাকে সাধারণ ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়ভাবে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনও একটা নির্দিষ্ট মত নয়, একটা নিগূঢ় চেতনা—একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আমার সুখদুঃখ অন্তরবাহির বিশ্বাসআচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে—কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব, সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজন-রহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান ক'রে পড়তে হ'লে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না, কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি ; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠবে,

আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা স্পন্দন চলছে ; আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কি হয়ে উঠবে জানিনে, কারণ, আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত-দেশকালের সঙ্গে যোগ ক'রে দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটে একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না। আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত ? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম ?··· আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎ-প্রাণের যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্চে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্য ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।"

সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ—কবি রবীন্দ্রনাথ এই মহত্তম ধর্ম লইয়া অবিরাম অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহার কাব্যসাধনায়। ইহার মধ্যে সাংসারিক জীবনে তাঁহাকে অনেক ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইয়াছে ; পত্রিকা-সম্পাদক, স্কুলমাস্টার, স্বদেশসেবক, গল্পলেখক, প্রবন্ধলেখক, ঔপন্যাসিক, সমাজ-সংস্কারক, পল্লীসংস্কারক—অল্পবিস্তর প্রত্যেক ভূমিকায় তিনি খুব উৎসাহ লইয়াই কাজ আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্তি ও আশ্রয়ের জন্য তাঁহাকে বারবার প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছে তাঁহার কাব্যদেবতার মন্দিরে। তাঁহার এই বাণীসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁহার একাত্মতায়। জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া কবি তাই ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন—

"অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই।

এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে-মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্ম-নিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্যঅভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।"

—জয়ন্তী "প্রতিভাষণ"

রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত বাল্যবয়সে 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা' ও 'জ্ঞানাঙ্কুরে' কবিতা গান প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সত্যকারের সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র হইয়াছিল 'ভারতী'। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম সাত বৎসর (১২৮৪-৯০) এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর বউদিদিরা রবীন্দ্রনাথকে বরাবর সাহিত্যরচনায় উৎসাহ দিতেন। নিতান্ত খেলাচ্ছলে বালক রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাতে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কাব্য ও সমালোচনা সাহিত্যের মকৃশ করিতে থাকেন। আশ্চর্য এই—ফলনের অজস্রতায় যাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, অকালে নিঃশেষ হইয়া তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। এই অকালমৃত্যুর দেশে এই ফলপ্রাচুর্যময় দীর্ঘজীবন অভাবনীয় ও বিস্ময়কর। 'ভারতী'র যখন চল্লিশ বৎসর বয়স, ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথ "তখন ও এখন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—

"সেইজন্য এই কথাটাই আমার আজ সর্বপ্রথমে মনে পড়িতেছে যে, দৈবক্রমে চল্লিশ বছর আগে আমি যোলোয় পড়িয়াছিলাম। যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম তাহা আজ যোলো বছরেরই যোগ্য, তবু প্রশ্রয় পাইয়াছিলাম।··· তাহার ফল কি হইয়াছিল? দক্ষিণ হাওয়ার প্রশ্রয় পাইয়া বসন্তে যেমন অজস্র আমের বোল ধরে তেমনি অজস্র লিখিয়াছি। তবু হাজার প্রশ্রয় পাইলেও যাহা ঝরিবার তাহা ঝরে, যাহা ফলিবার তাহা ফলে। অতএব

সেই প্রথম মুকুল প্রায় সবই ঝরিয়াছে। কিন্তু সেই অপ্রতিহত প্রাণের উদ্যমটা রহিয়া গেছে।"

কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রাণের উদ্যম প্রায় পঞ্চাশটি কাব্য ও কবিতা-পুস্তকের জনয়িতা, এর মধ্যে অন্তত কুড়িখানি বই পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দুই হাজারেরও অধিক গান রচনা ও তাহাতে সুর যোজনা করিয়াছেন, পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যে এগুলি সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে। এই গানগুলির সুর এবং কথা বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আছে, অনেক নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের একজন, সাহিত্যের এই বিভাগেও তাঁহার অজস্র দান। তিনি শতখানেক গল্প লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সমস্ত পৃথিবীর ছোটগল্পের আদর্শ হইয়া আছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতির প্রবর্তক—আজকাল যাহাকে সাইকলজিকাল উপন্যাস বলা হয় এই বাংলাদেশে তাঁহার 'চোখের বালি' দিয়াই তাহার সূত্রপাত। প্রবন্ধলেখক হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে অদ্বিতীয়, এক্ষেত্রেও তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'সঞ্চয়'. 'কালান্তর', 'পরিচয়' প্রভৃতি অসামান্য গৌরবে প্রতিষ্ঠিত আছে। সাহিত্যের সকল বিভাগে তাঁহার অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ গতি; 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'ছন্দ' প্রভৃতি পুস্তকে তিনি প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের যে আদর্শবিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সাহিত্যের মূল নীতিগুলিকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বঙ্কিমপরবর্তী যুগে তাহা আজিও আমাদের আদর্শ হইয়া আছে; আমরা তাঁহারই মানদণ্ডে সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করিতে শিখিয়াছি। শিক্ষা, সমাজ ও স্বাদেশিকতা বিষয়েও তাঁহার অজস্র রচনা কয়েকটি পুস্তকে এবং কয়েকটি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মসচেতন করিয়াছে; তিনি আমাদিগকে ভাবিতে ও কাজ করিতে শিখাইয়াছেন। ভাষা ও ব্যাকরণ-শিক্ষার দিকেও তিনি একদিন দৃষ্টি দিয়াছিলেন; এদেশের শিক্ষাপদ্ধতিকে সহজ সরল করিয়া তুলিবার জন্যে তাঁহার অক্লান্ত প্রয়াসের প্রমাণ তাঁহার বহু রচনায় বিধৃত আছে। এদেশে মিষ্টিক নাট্য একমাত্র তিনিই লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। এক কথায়, তাঁহার সেই প্রাণের উদ্যম

আমাদের বাংলা সাহিত্যকে অনেক বিচিত্র সম্ভাবনার মধ্যে লইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে কোনও একজনের দ্বারা এখন পর্যন্ত এমন বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয় নাই। ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁহার দান স্বীকৃত, ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বইয়েও তাঁহার রচনা আদর্শ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মানুষের ধর্মবোধকে স্থান এবং কালের সঙ্গে মিলাইয়া কার্যোপযোগী করার কাজ তথাকথিত অবতারদের; সাহিত্য এবং শিল্পের বোধ যাঁহারা এভাবে পরিবর্তন করিতে পারেন সাহিত্যের অবতার তাঁহারা। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি পৃথিবীর বর্তমান চিন্তাধারাকে অনেক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়া বিদায়ের প্রাক্কালে বর্তমান সংশয়-সন্দেহের যুগে একমাত্র তিনিই তাঁহার চির-আরাধ্য স্রষ্টাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিয়াছেন—

"এই জ্যোতি-সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই।
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
প্রকাশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই॥"

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, তিনি আমাদের মধ্যেই আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বলে তিনি আমাদের দেশ ও জাতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন।

মানুষ রবীন্দ্রনাথ কোনও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথকে আমাদের মধ্যে সঞ্জীবিত রাখিতে হইলে তাঁহার কাব্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত পরিচিত হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালী রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্পদকে সম্যক্ মর্যাদা দিতে আজও শেখে নাই। তাঁহার জন্মের এই শতবার্ষিক উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যদি কবি রবীন্দ্রনাথকে আমাদের অন্তরে গ্রহণ করিতে পারি, তবেই এই উৎসব সার্থক হইবে।

২৫ বৈশাখ, ১৩৬৭

ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ*

বুদ্ধ ও চৈতন্যের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্তী কালে এই দুই মহাপুরুষের প্রভাব দেশের জনগণের ওপর কেমন ছিল, তার কিছু কিছু পরিচয় পালি-সাহিত্যে এবং বাংলা-সাহিত্যে মেলে। দেখতে পাই, একটা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল, আবেশ লেগেছিল ভক্তদের চিত্তে। দেশের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, ভাস্কর্য, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সবই যে অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সাধারণ ও অসাধারণ লোক দলে দলে ভিক্ষুশ্রমণ অথবা বৈরাগী-বৈষ্ণব হয়ে সংসারধর্ম পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ সামাজিক জীবনে বহুবিধ বিপর্যয় ঘটিয়েছিলেন এঁরা।

কিন্তু এঁরা উভয়েই ছিলেন ধর্মপ্রবর্তক ; জাতির অতিশয় সঙ্কটকালে মুক্তির নূতন পন্থা নিয়ে এঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, দেশ ও কাল—দুইই অনুকূল ছিল। এক জনের আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকালে, অন্য জনের মধ্যযুগে। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি তখনও পরিপুষ্টি লাভ করে নি, অলৌকিকের প্রতি মানুষের মোহ কাটে নি।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিজ্ঞানধর্মী আধুনিককালে, যুক্তির সাহায্যে সর্ববিধ সংস্কার-মুক্তির প্রয়াসের মধ্যে। কোনও সঙ্কটকালের পথনির্দেশক অর্থাৎ ধর্মপ্রবর্তকরূপেও তিনি আসেন নি। তিনি এসেছিলেন কবি হিসেবে, সাহিত্যশিল্পী হিসেবে, সঙ্গীতস্রষ্টা হিসেবে। কিন্তু এই কবি-কর্মের মধ্যেই তিনি মানুষের চিত্তকে এমন ভাবে অধিকার করেছিলেন যে, এই সংশয়শাসিত যুগেই তিনি অনুরূপ বিপর্যয় ঘটিয়ে গেছেন ; ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শিক্ষা, সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার—সমস্ত কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছে তাঁর সংস্পর্শে। ধর্মেতর ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীর বর্তমান ইতিহাসের মধ্যে কোথাও এমনটি আর ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ পরম বিস্ময়ের মতই র'য়ে গেলেন। তিনি শুধু যুগপ্রবর্তক মাত্র রইলেন না, সমস্ত যুগটাই তাঁতে বিধৃত হয়ে রইল।

---

* ১৩৫৪ সালের ২৭ বৈশাখ নিখিল-ভারত-রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতির ভাষণ।

তাঁর সাহিত্য কাব্য বা সঙ্গীতের মহিমাকীর্তন স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। সে আলোচনা গাঢ় মনোযোগ ও দীর্ঘকালের সাধনার অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্র-রচনার গভীর গহনের মধ্যে তার জন্যে বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই প্রবেশ করতে হবে। শুধু 'সঞ্চয়িতা' 'গীতাঞ্জলি' 'শেষের কবিতা' 'বলাকা' 'মহুয়া' ও 'নবজাতকে'র সঙ্গে স্পর্শ-গভীর পরিচয় থাকলেই চলবে না। অথচ এইটা করাই এরই মধ্যে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন না হ'লে আমাদের স্বাভাবিক পল্লবগ্রাহিতা রবীন্দ্রনাথকেও অপমান করতে থাকবে।

আজ এই স্মৃতি-পূজার উৎসবে আমি শুধু ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব, বাঙালী রবীন্দ্রনাথকে নয়, কবি রবীন্দ্রনাথকে নয়, বিশ্বের রবীন্দ্রনাথকেও নয়—যে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে অন্তরে ধ্যানের মত ধারণ করেছিলেন, তাঁকে। কারণ ভারতবর্ষের আজ বড় বিপদের দিন এসেছে। সে শুধু ভৌগোলিক আয়তনেই খণ্ডিত হতে যাচ্ছে না, তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাবার ঘোর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে।

আমাদেরই অব্যবহিত পূর্বকালে দু জন বাঙালী মহাপুরুষ ভারতবর্ষের বিপুল মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন, এক জন স্বামী বিবেকানন্দ, অন্য জন কবি রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষের যথার্থ গৌরব তাঁরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দ জ্ঞানযোগী হয়েও কর্মী ছিলেন, তাঁর সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষকে তিনি সাধ্যমত ঐক্যে প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা আরও বড় ছিল, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে আমাদের এখনও অনেক তপস্যার প্রয়োজন হবে। তাঁর প্রার্থনা এই—

"হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল কর। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্য লাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারি পথ—আমাদের বৃদ্ধ-পিতামহদের

পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অত্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্র নিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততোভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

"একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা, ক্ষমতার মত্ততা, স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনো ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্য সত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মাভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না—ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহু শতাব্দী হইতে নানা দুঃখ অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।"

রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের আদর্শ তাঁর চিঠিপত্রে আরও পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি বলছেন—

"যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোন মতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিয়ো, য়ুরোপীয় বর্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিও। তাহারা বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধনমুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।...তুমি ক্ষত্রিয় তাহা কদাপি বিস্মৃত হইও না।...অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম, অনাচার হইতে দেশকে সমাজকে রক্ষা করা, ইহাই ক্ষত্রিয়ের কুলব্রত।... ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি। এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারিবে।...ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে সমাজে প্রচার করিবার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো।...বলবীর্য তেজ সমাজে কে রক্ষা করিবে? সেই ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়? ব্রাহ্মণের শান্তি কাহার অটল বলের উপরে নিজেকে রক্ষা করিবে? সমাজে ধর্মের উচ্চতম আদর্শকে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও বিঘ্ন হইতে সুরক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যই ক্ষাত্রতেজের মাহাত্ম্য।...নিজেকে ও নিজের সমাজকে বীর্য দাও, অভয় দাও, আশ্বাস দাও, ধর্মরক্ষা ও আত্মত্রাণ ব্রতে দীক্ষিত করো—তোমার জীবন চরিতার্থ হউক—..."

ঠিক পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তরুণকে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন; বাংলা দেশে অন্তত ক্ষাত্রধর্ম জাগ্রতও হয়েছিল, কিন্তু বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় চক্রান্তে প'ড়ে তা শেষ পর্যন্ত আত্মকলহে পর্যবসিত হ'ল। এ দুর্গতিও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখেছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের জন্মোৎসবদিনে সভ্যতার সঙ্কটে ভীত হয়ে তাঁকে বলতে হয়েছিল—"সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের

চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসন-যন্ত্রের ঊর্ধ্ব স্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হ'ত, তা হ'লে কখনই ভারত-ইতিহাসের এত বড় অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না, যে দুর্গতির তুলনা অন্যত্র কোথাও নাই।···

"একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম, য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা ক'রে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা ক'রে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

এই হচ্ছে কবির শেষ বাণী, শেষ আশা। ভারতবর্ষের প্রতি তিনি কখনও বিশ্বাস হারান নি। ভারতবর্ষের একাংশ আজ খণ্ডিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের

ভারতবর্ষের সকল গৌরবকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, অস্বীকার করছে ভারতীয় ঐতিহ্যকে, অস্বীকার করছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে। আপাতত মাতৃভূমির মাঝখানে বিচ্ছেদের দেওয়াল তুলে দিয়ে এই অপমান ও দুর্গতি থেকে আমরা আত্মরক্ষা করবার কল্পনা করছি। কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের আদর্শ নয়। আমরা নিরুপায়। অহেতুক আত্মঘাত নিবারণের জন্যে রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থে, এই মহামানবের সাগরতীরে সম্মিলিত হবার আগেই আমরা ঠাঁই ঠাঁই হয়ে পড়ছি। আমাদের মধ্যে আশাবাদী যাঁরা, তাঁরা এখনও এই দুর্যোগাবসানের স্বপ্ন দেখছেন, কল্পনা করছেন, পূর্ণ মঙ্গলঘট নিয়ে মায়ের অভিষেকে আমরা অচিরাৎ আবার মিলিত হব, রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ জয়যুক্ত হবে।

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ গৃহগত, বিদ্যালয়গত ও সমাজগত শিশুশিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা এবং জাতিনিরপেক্ষ ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে যত মৌলিক চিন্তা করিয়াছেন ও লিখিতভাবে যত কথা বলিয়াছেন পৃথিবীর কোনও প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টিধর্মী কবি তত চিন্তা করেন নাই বা তত কথা বলেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারা পূর্বাপর অনুসরণ করিয়া তাঁহার বক্তব্যের সার কালানুক্রমিক হউক অথবা বিষয়ানুগ ভাবে হউক সাজাইয়া দিলেই শিক্ষা-বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তিনি নিজে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে) অর্থাৎ স্বদেশী আমলে, শিক্ষাবিষয়ে তখন-পর্যন্ত প্রদত্ত তাঁহার লিখিত ভাষণ ও রচিত প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া 'শিক্ষা' নাম দিয়া একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে "শিক্ষার হেরফের" (১৮৯২) "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" (১৯০৫), "শিক্ষা-সংস্কার" (১৯০৬), "শিক্ষা-সমস্যা" (১৯০৬), "জাতীয় বিদ্যালয়" (১৯০৬), "আবরণ" (১৯০৬) ও "সাহিত্যসম্মিলন" (১৯০৬) এই কয়টি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৩৪২ সালের শ্রাবণে প্রকাশিত প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণে (৩য় সং) তপোবন (প্রবাসী, মাঘ ১৩১৬), শিক্ষার বাহন (সবুজপত্র, পৌষ ১৩২২), মনোবিকাশের ছন্দ (শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩২৬); শিক্ষার মিলন (সবুজপত্র, ভাদ্র ১৩২৮), লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য (প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৫), ধ্যানী জাপান (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৬), পল্লীসেবা (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৭), আলোচনা (শান্তিনিকেতন-পত্রিকা), ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ (উদয়ন, শ্রাবণ ১৩৪১ অনূদিত), শিক্ষা ও সংস্কৃতি (বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪২), শিক্ষা-বিধি (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৯) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রূপ" (১৩৩৯) ও "শিক্ষার বিকিরণ" (১৩৪০) প্রবন্ধগুলি যোজিত হয়। তৎসঙ্গে 'যাত্রী' গ্রন্থ হইতে একটি পত্র (১৩৩২) এবং তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত একটি পত্র (১৩৩৬) এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের বৎসরাধিক কাল পরে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দ্বাদশ খণ্ডে 'শিক্ষা' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণকালে "ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ" প্রবন্ধটি বাদ দিয়া প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন পরিশিষ্ট

৫০১-৫২৯ পৃষ্ঠায় "শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি", "প্রসঙ্গ কথা", "প্রাইমারি শিক্ষা", "পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি", "বিজ্ঞান সভা", "ইতিহাস-কথা", "স্বাধীন শিক্ষা", ও "শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা" এই কয়টি শিক্ষা-বিষয়ক রচনা ১৩০০—১৩১২ বঙ্গাব্দের 'সাধনা', 'ভারতী' ও 'ভাণ্ডার' পত্রিকা হইতে সঙ্কলন করিয়া দেন। 'রচনাবলী'র এই খণ্ডের "গ্রন্থপরিচয়ে", "শিক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন তাহার সমর্থনে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর পত্রাংশও ১২৯৯ চৈত্রের 'সাধনা' হইতে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত "প্রসঙ্গকথা"র বিস্তৃত উদ্ধৃতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পটলডাঙার মল্লিকবাড়িতে ১৩১২ সালের ১০ই কার্তিক সভাপতি-রূপে, 'ফিল্‌ড্‌ অ্যাণ্ড একাডেমী' ভবনে ১৩১২, ১৬ই কার্তিক ও 'ডন সোসাইটি'তে ১৩১২, ১৯ কার্তিক প্রধান আলোচকরূপে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারাংশও "গ্রন্থপরিচয়ে" দেওয়া হইয়াছে। পরে ১৩৫১ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'শিক্ষা'র পরিবর্ধিত সংস্করণে শ্রীপুলিনবিহারী সেন শিক্ষাসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা সঙ্কলন করিয়াছেন; ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (১৯২১ খ্রীঃ) প্রদত্ত প্রসিদ্ধ ভাষণ "শিক্ষার মিলন", ১৩৩৯ সালে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা (১৯৩৩) "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ", "শিক্ষার বিকিরণ" এবং ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত 'শিক্ষার ধারা' পুস্তক হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এডুকেশন উইক কনফারেন্সে পঠিত (১৯৩৬) "শিক্ষার সাঙ্গীকরণ" "শিক্ষা ও সংস্কৃতি" ও "আশ্রমের শিক্ষা" প্রবন্ধত্রয় এবং ১৯৩৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে প্রদত্ত তাঁহার "ছাত্রসম্ভাষণ" (ফাল্গুন ১৩৪৩)—এই সকলই ১৩৫১ সালের পরিবর্ধিত সংস্করণ 'শিক্ষা'য় দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এখনও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ, মন্তব্য বা আলোচনা সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

নিতান্ত তরুণ বয়সের 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' বাদ দিলে "শিক্ষার হেরফের"কেই শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা বলিতে পারি। এই প্রবন্ধে তাঁহার প্রধান বক্তব্য ছিল, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপদ্ধতির নিছক অনুকরণে শিক্ষা না দেওয়া, শিক্ষাকে একটা কঠিন দুরূহ ভয়সঙ্কুল ব্যাপার না করিয়া মনের আনন্দ ও মুক্তির মধ্যে শিক্ষাকে ধীরে ধীরে অগ্রসর

করানো এবং মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রবর্তন করা। এই শেষেরটির উপরেই তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন—

"ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে ; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা, কেবলই ঠেঙা-লাঠি মুখস্থ এবং একজামিন—আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে। যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা-সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা, পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে—যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে—তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও—য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও—সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনী-শক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।"

এই মূল কথাটাই রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে নানা ভাবে—পত্রে, প্রবন্ধে, নাটকে, গল্পে, এমন কি, কবিতাতেও বার বার বলিয়াছেন। 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) এবং বাল্যস্মৃতি 'ছেলেবেলা'(১৯৪০)তেও শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা প্রসঙ্গে অতি চমৎকার ভাবে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষগুণ বিচার করিয়াছেন। প্রাণহীন গতানুগতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁহার সর্বপ্রথম সাহিত্যিক অভিযান ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (১৯১২) লিখিত 'অচলায়তন' নাটকে। এই অচলায়তনে শিক্ষা ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে বদ্ধ বলিয়া গোঁড়া সনাতন সমাজ ইহার প্রকাশে বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য ছিল সেই গোড়ার কথাটাই—শিক্ষার সাহায্যে মনের মুক্তি, আনন্দলব্ধ জ্ঞানের মধ্য দিয়া সংস্কারের জড়তা মোচন, যে জড়তাকে আঁকড়াইয়া 'অচলায়তনে'র উপাচার্য বলিতেছেন—

"ঠিক আছে, ঠিকই চলচে, আচার্যদেব, ভয় নেই! প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হ'য়ে ব'সে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্বনাশ! সেই ছায়া!"

রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, সেই ছায়া নাড়াইয়া দিলেন উপাচার্য-গুরু আচার্যেরও গুরু দাদাঠাকুর নিজে আসিয়া। আচার্যকে বলিলেন—

"তুমি এ কী করেছ!···যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ!"

অতএব ভাঙো কারাগারের দ্বার, খোলো মন্দির।

ইহাই 'অচলায়তনে'র অভিযান।

দ্বিতীয় অভিযান বিশ্ববিদ্যালয়ের মামুলী শিক্ষার বিরুদ্ধে। তাঁহার 'পয়লা নম্বরে' (বৈশাখ ১৩২৭; ১৯২০) প্রকাশিত "তোতা-কাহিনী" গল্প যে শোরগোল তুলিয়াছিল তাহা আজিও অনেকের স্মরণে আছে। ইংরেজী 'Parrot's Training' অবনীন্দ্রনাথের চিত্রসহযোগে বাহির হইয়া গোলযোগটাকে আরও পাকাইয়া তুলিল। এই কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছিলেন, পাখীকে শিক্ষা দিবার জন্য ঘটা করিয়া খাঁচাটাই বানানো হইল, পর্বতপ্রমাণ পুঁথির আমদানি করা হইল, কিন্তু আসলে সে যে একটা জীবন্ত প্রাণী, বাঁচিয়া থাকার পক্ষে তাহার আলো-বাতাসের, রসের, আনন্দের একান্ত প্রয়োজন, সেই

কথাটাই কর্তারা ভুলিয়া গেলেন। কাজেই আয়োজন-আড়ম্বর, জাঁকজমক-চাকচিক্য যথেষ্ট হইল, কিন্তু পাখীটা মরিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে গল্পটি শেষ করিয়াছেন—রাজা ভাগিনেয়ের হাতে পাখীর শিক্ষার ভার দিয়াছিলেন—

"ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পূরা হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায় ?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে ?'

'না।'

'আর কি গান গায় ?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?'

'না।'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।'

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্, গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।"

এই যে প্রতিবাদ ইহার কারণ দূর অতীতে নিবদ্ধ ছিল। তিনি নিজের জীবনে এই আনন্দহীন শিক্ষার বেদনায় জরজর হইয়াছিলেন। পাঠশালাগত শিক্ষায় এই কারণেই তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন—

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভরতি হইলাম। সেখানে কী শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি স্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির হইতে অন্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে কি না তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের আলোচ্য।"

বাহিরের শিক্ষা কাজেই কাজে লাগে নাই। বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর। তিনি কোথায় ভিত্তি

আলগা করিয়া দিয়াছিলেন আর কোথায়ই বা তাঁহা দৃঢ়তর করিয়াছিলেন 'ছেলেবেলা'য় তাহা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে স্মরণ করিয়াছেন—

"সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতা কল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এই কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন বড় শাসনকর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশী টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশী মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে একথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল।"

এই সেজদাদাই কি ভাবে লাভের বিদ্যাটাও পাকা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ সকৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিয়াছেন—

"সেজদাদা বলতেন আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি তারপরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নিচে তখনও বি এ ডি ব্যাড এম এ ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয় নি।"

পৌঁছায় নাই বলিয়াই বাল্যে বাংলা-সাহিত্যে-পারঙ্গম এবং ইংরেজিতে অপটু রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনা ভবিষ্যতে ইংরেজি সাহিত্যেও গৌরবের আসন অর্জন করিতে পারিয়াছে। সেজদাদার এই মাতৃভাষা-শিক্ষা-ব্যবস্থার কথাটা স্মরণ ছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার হেরফেরে" (১৮৯২) শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন আরম্ভ করিতে পারিয়াছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন—

"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা-জিনিসটা যথাসম্ভব আহার-ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালীর পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্ধেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন

একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।"

যদি কেহ প্রশ্ন করেন—শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য কি, তাহা হইলে গোড়াতেই শিক্ষার medium বা বাহন সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত কি তাহা জানা দরকার। "শিক্ষার হেরফেরে" তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন এবং উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতেও আমরা জানিলাম যে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করাটাই হইতেছে তাঁহার মতে গোড়ার কথা। শিক্ষার আদর্শ কি তাহাও তিনি চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন, সতীশচন্দ্র রায়ের 'গুরুদক্ষিণা' পুস্তকের ভূমিকায়। ১৩১১ সালে অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন হাতেকলমে সেই পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারও চারি বৎসর পূর্বে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে; এই আদর্শ অনুসারেই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের পত্তন হয়। এই আদর্শকে রূপ দিবার জন্য বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি নিদারুণ কর্মবন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা শুধু ভাবের বা আদর্শের ফাঁকা কথা নয়, তাহা নিষ্ঠাবান কর্মীর সারাজীবনের সাধনার কথা। শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতে হইলে এই কারণেই এই আদর্শের কথা বলিয়া কথারম্ভ করিতে হইবে। আমরা তাহাই করিলাম। তাঁহার নিজের ভাষায় সেই আদর্শ এই—

"বোলপুর ষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত 'শান্তিনিকেতন' নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তমান-প্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক শুদ্ধ-শুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনকার্য্যকে যথার্থ ধর্মব্রত-স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়—ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।…

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্ত্বছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্তির সহিত কর্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে—যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে, তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে—নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।…

এই বিদ্যালয়ের কল্পনা আমার মনের মধ্যে যে কি ভাবের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া না বলিলে এ রচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনো বন্ধুকে আমি এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

'মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্ব্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্ম্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে

এই একটুখানি স্থান থাকিবে,—যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধন-পীড়নের বাহিরে। ইংরাজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত ;—আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি ; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক ; কে আমাদের স্টেট্‌সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়—কে কোন্ আইন করিল, এবং কে সে আইন উল্টাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘরৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণগুল্মে ও ঋতুপর্য্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা, এখানকার নিভৃত শান্তি ও সরস সৌন্দর্য্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে, এবং বালিকারা গোদোহনকার্য্য সারিয়া কুটীরপ্রাঙ্গণে, গৃহকার্য্যে শুচিস্মাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও সয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়াই কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে ? যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি সয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শ মাত্রই মিলেনিয়ামের দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে ? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সঙ্কল্প আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা, ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কি করিয়া ? আমাদের মাথা তুলিবার স্থান ত নাই-ই, মাথা রাখিবারও স্থান প্রত্যহ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মত আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্ব্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে। সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই, সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।'

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে, তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, 'বর্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।'

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের নিত্যপদার্থটি যে কি, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে, তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর একটি মাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না—ত্রিশ কোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। একথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরাজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন, তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন, বাকি অধিকাংশই আপন আপন কর্মে লিপ্ত। অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধি দান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে—কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।"

কর্মী রবীন্দ্রনাথ*

সাক্ষাৎ চোরাবাজার হইতে নগদ চার আনা মূল্যে একটি ওজনে ভারি বই খরিদ করিয়াছিলাম—*National Council of Education, Bengal. Calender 1906—1908*। নানা নামের তালিকা ও হিসাবপত্রের তথ্য-সমন্বিত বই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার যেমন হয়; গোড়ায় উদ্যোগ-পর্বের সভার মিনিট্‌স এবং শেষে লঙ্কাকাণ্ড অর্থাৎ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র। কৌতূহল-মিশ্রিত কৌতুকের সঙ্গে একদিন নিতান্ত অবসর-সময়ে পাতা উলটাইয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি বাংলা প্রশ্নপত্রের দিকে নজর পড়িল, উপরে লেখা—"Paper set by—Babu Rabindra Nath Tagore।" রবীন্দ্রনাথের কৃপায় কবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, গল্প, উপন্যাস, রূপকথা, ব্যঙ্গকৌতুক, হাস্য-কৌতুক, প্রবন্ধ, ডায়ারি, জীবনস্মৃতি, ছিন্নপত্র, ভূমিকা, বিজ্ঞাপন, প্রশংসাপত্র, শব্দতত্ত্ব, ইংরেজি-শিক্ষা, সংস্কৃত সোপান, ছুটির পড়া, বিশ্ব-পরিচয়, মন্দিরের উপদেশ, রাজনীতি মায় অনুবাদ-চর্চা জাতীয় বহু প্রকারের বিচিত্র বস্তু পড়িবার সুযোগ হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ-রচিত প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ অভিনব মনে হইল। অবশ্য অভিনব সকলের কাছে মনে হইবে না; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে একদিন যখন তিনি ঘটা করিয়া মাস্টারি করিয়াছেন, তখন নিশ্চয় তাঁহার প্রশ্নপত্রের সহিতও সেকালের ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু ছাপার অক্ষর অথবা হাতের লেখায় তাহা কখনও নজরে পড়ে নাই। বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রশ্নপত্রগুলি পড়িতে লাগিলাম। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির আকস্মিক খেয়াল হিসাবে এগুলিকে গণ্য করিতে পারিলাম না; বেতনভোগী শিক্ষকের দায়-সারা মামুলী প্রশ্নপত্র বলিয়াও মনে হইল না। আজকাল সর্বত্রই যাহা দেখিতে পাওয়া যায়—খোসাবিহারী জ্ঞান অথবা ছেলে-ঠকানো দুর্বুদ্ধির ছাপ এগুলিতে নাই, বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষার্থীর সত্যকার বিদ্যা যাচাই করিবার ভদ্র এবং সহজ প্রয়াস প্রত্যেকটি প্রশ্নে লক্ষিত হইল। প্রশ্নপত্র ছাড়িয়া বহুরূপী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মনে জিজ্ঞাসা জাগিল।

---

* রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অংশ তিনি স্বয়ং দেখিয়া দিয়া এই প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশের অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৩৪৭ সনের বৈশাখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

খোদ রবীন্দ্রনাথের কাছে হাজির হইলাম, তাঁহার রচিত প্রশ্নপত্রগুলি তাঁহারই সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলাম। ম্লান হাসির সঙ্গে তিনি বলিলেন, যাঁরা শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী আর শ্রীনিকেতনকে কবি-খেলোয়াড়ের শুধু দুদিনেরই খেলা ভেবে এবং প্রচার করে মনে মনে আশ্বাস লাভ করে থাকেন, তোমার এই আবিষ্কারে তাঁরা ব্যথিত হবেন। এগুলি প্রমাণ করবে যে, আমি হঠাৎ আকাশকুসুম রচনা করতে বসি নি, আজীবন এ নিয়ে ভেবেছি এবং ভাবনাকে সাধ্যমত কাজে খাটাবার চেষ্টাও করেছি। নিষ্ফলতার দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু ফাঁকি দেওয়ার সান্ত্বনা পাই নি।

দেখ, দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধ রূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশী ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয় নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। শুধু সভা আর পরামর্শ—পরামর্শ আর কাজ। দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে ইতিহাস কেউ লিখে রাখে নি। আজ চেষ্টা করলেও তোমরা সে নষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করতে পারবে না, টুকরো টুকরো খবর পাবে, কিন্তু আমাদের সেই নিরলস সাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস কোনও দিনই আর লোকচক্ষুর গোচরে আসবে না। আসবে না, তার বড় কারণ এই যে, আমারই স্বহস্তরচিত সেই বিপুল উদ্যমের খসড়া যাঁদের হাতে ছিল, রাজার প্রহরীর ভয়ে তাঁরা একদিন তা নিঃশেষে অগ্নিসাৎ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আমার অনেক দিনের অনেক ভাবনা সেই সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার-চেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার, কুটীরশিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের

যাবতীয় দ্রব্য নির্মাণ—আমরা করি নি কি? জ্যোতিদাদা সবস্ব খুইয়ে জাহাজের খোল কিনে এই অকৃতজ্ঞ দেশের খেয়াপারের কাণ্ডারী হবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। বিদেশীদের সঙ্গে পাল্লায় উৎসাহী দেশপ্রেমিকের তিলে তিলে সর্বস্ব ত্যাগের আত্মঘাতী মহিমার প্রতি বিন্দুমাত্র দরদী না হয়ে তারা খাবারের ঠোঙা হাতে মজা দেখেছে, একজনও কেউ এগিয়ে গিয়ে বলে নি, বহুত আচ্ছা, আমিও আছি। আমারই কি কম লাঞ্ছনা ঘটেছে! বিজ্ঞতার ভান করে দেশের কল্যাণের কাজে যিনি যে উপদেশ দিয়েছেন, সরল বিশ্বাসে আমি তাই পালন করতে গিয়ে সবস্বান্ত হয়েছি। তাঁদের কর্তব্য বক্তৃতা এবং উপদেশ পর্যন্ত গিয়েই সমাপ্ত হত, আমি গাঁটের কড়ি খরচ করে শেষ পর্যন্ত দেখতে চাইতাম। কুষ্টিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আমার তাঁতের কারখানার ইতিহাস যদি কোন দিন জানতে পাও তো দেখতে পাবে, ওই তাঁতের সুতো ধরে আমি সর্বনাশের দরজা পর্যন্ত পৌছতেও ইতস্তত করি নি। সুতো সরবরাহ করে যাঁরা আমাকে ঠকিয়েছিলেন, তাঁরা আমারই দেশের লোক, স্বদেশীয়ানাকে মূলধন করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ঠকাটাকে গ্রাহ্য করি নি, পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়েছি, একদিন সত্য একটা কিছু পাব এই আশায়। আলুর চাষ, গুটিপোকার চাষেও নামজাদা এক্সপার্টদের পরামর্শে কম লোকসান দিই নি। দুঃখ সেই লোকসানের জন্যে নয়; যাঁরা আমাকে এই সব কাজে নামিয়েছিলেন, তাঁদের অসাধুতা আমাকে সবচেয়ে আঘাত দিয়েছে। যাঁদের অভিজ্ঞতার মূল্য সরকারী তহবিল থেকে মাসে মাসে দেওয়া হত, কাজের বেলায় বারবার দেখলাম, তাঁদের অনভিজ্ঞতার যূপকাষ্ঠে সরল বিশ্বাসে বলি হয়েছি আমরাই। সরকারী খেতাব এবং বেতন তাঁরা যথানিয়মেই পেয়ে গেছেন। দেশের প্রতি আমাদের স্বতঃ-উৎসারিত প্রেমকেই তাঁরা অপমান করেছিলেন সেদিন।

এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মত আমরা আব্দারের ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনটা হল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়। নিজেরা করব না, কাউকেও কিছু করতেও দেব না।

একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে সব পুরুষ এখানে

দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর-ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্যে দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংষ্ট্রা বের করে আছে।

এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছে বাংলা দেশে; বুদ্ধির অভাববশতঃ নয়, এর মধ্যে দুর্বুদ্ধি আছে, আছে শয়তানী। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অসাধুতা তার জয়পতাকা তুলছে; স্বার্থবুদ্ধি এবং স্বেচ্ছাচার সকল কল্যাণকে করছে বিনষ্ট। অভিভাবকদের অন্নে পুষ্ট দায়িত্বহীন ছাত্রদের নীতি-অমান্যের সহজ প্রবৃত্তিকে স্বাধীনতার দাবি বলে ঘোষণা করে তাদের ক্ষেপিয়ে অপরের সংকীর্তি যারা ধ্বংস করতে চায়, তারা নামে এবং মহিমায় যেই হোক, আসলে দেশের প্রবল শত্রু। আজকের দিনে তারাই প্রবল হয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমাদের বাঁচবার কোনও পথই নেই।

দেখ, আমার এই দীর্ঘজীবনের জন্যে এখন প্রায়ই মনে ধিক্কার জাগে। মনে এ আশাও নেই যে, কোন দিন এই ভাঙনের মধ্যে থেকেই সৃজনের দেবতার কাজ শুরু হবে। এখানে হবে না। মিথ্যার জঞ্জালস্তূপ ভেদ করে সত্যের অঙ্কুর উদ্গত হতে পারে না।

অথচ দেখ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় যাঁরা আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, কত অসুবিধার মধ্যে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে। তখন সেখানকার লোকের নৈতিক সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থা আমাদের চাইতেও হেয় ছিল। যে দুর্ভাগ্যের স্তরে তারা পৌঁছেছিল, আমরা তার কল্পনা করতে পারব না। কিন্তু জননায়করা মিথ্যার কারবার করেন নি বলে সেই ভয়াবহ পঙ্ককুণ্ড থেকে সমগ্র জাতিকে টেনে তুলতে বড় বেশী সময় লাগে নি। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, তখন এই বিপ্লবের বয়স দশ বছরও হয় নি। দেখলাম, দেশের চেহারা বদলে গেছে. সাইবেরিয়ার নরক-স্নান সেরে নতুন স্বর্গ রচনায় তাদের সে কি উৎসাহ! যার যা সম্পদ—মানসিক অথবা দৈহিক, সে তাই খাটাচ্ছে তার পাশের লোককে উন্নত করার কাজে। সর্বনাশা স্বার্থবুদ্ধি তাদের আত্মকেন্দ্রিক করে নি বলেই রাতারাতি দেশটা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সে কি বিপুল জাগরণ! এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার—শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজ পাশাপাশি অগ্রসর হয়ে ছড়িয়ে পড়ল দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত। এই lateral movement সম্ভব হয়েছিল—যাঁরা এদের নেতৃত্ব করেছিলেন, শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাঁদের সত্যনিষ্ঠার জোরে। বাঙালীর মত মিথ্যাচারকেই তাঁরা আঁকড়ে পড়ে থাকেন নি।

বাঙালীও সুযোগ পেয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম তার পরিচয়; সে যুগের বাঙালীরা এই পরিচয়কে কাজে লাগিয়েছিল, ফলে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশকে পিছনে ফেলে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালী চলেছিল এগিয়ে। এই সাধনার পুরস্কার সে লাভ করেছিল তার শিল্প ও সাহিত্যের ফসলে। কিন্তু জাতিগঠনের কাজ তার একটুও এগোয় নি। কারণ, শিল্প ও সাহিত্য ব্যক্তির কাজ, একের কাজ, খোশখেয়ালের খুশিতে নিভৃত রাত্রির অবসরে তার সাধনা। কিন্তু জাতি গড়ার কাজ একলার নয়, এ কাজে মিলতে হবে সকলকে। এই মিলতে বাঙালী পারলে না। দল বেঁধে দলাদলি করে গড়ে তোলার সব কিছু সম্ভাবনাকে সে ভেঙে ভেঙে চলেছে। আজ সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার এই অস্বাস্থ্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। সমস্ত ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলা দেশ। অথচ বাঙালীর আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে,—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভাল আজ কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না। বাঙালী যেখানে যতটুকু কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং আজও দেখাচ্ছে, অবাঙালীরা তা স্বীকার করে নিতে এতটুকু কার্পণ্য করে নি বা করে না। চোখ মেলে চাইলেই এর হাজার দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। সামনেই একটা দৃষ্টান্ত রয়েছে। আজ আমি যেখানে অতিথি হয়ে রয়েছি, আমার বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ক্ষেত্রেই দেখছি, দীর্ঘদিনের সাধনায় স্ট্যাটিস্‌টিক্সের কাজে যে দক্ষতা তিনি অর্জন করেছেন, তারই জোরে প্রতিদিন অজস্র সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন; তিনি বাঙালী ব'লে অবাঙালীরা তাঁর প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করেছেন না। নিঃসঙ্কোচে সকলে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করছেন। বাঙালী-বিরোধের কথা সত্য হ'লে এমনটি সম্ভব হ'ত না।

ধ্বংস করবার কাজে কোন কৃতিত্বের প্রয়োজন নেই, বাঙালী আজ এতেই পটু হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ চালাবে অথচ শৃঙ্খলা মানবে না, পৃথিবীতে এমন

অদ্ভুত সমরায়োজন আর কুত্রাপি দেখা যায় নি। বাঙালীর যুদ্ধ বাইরের কোনও শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর, নিজের সঙ্গে ; পরকে উপলক্ষ ক'রে ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে এরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে ; সে ছুরিও কোন ধাতুর তৈরি নয়—কুৎসা। এবং কাদা দিয়ে তৈরি তার অস্ত্র। বড়কে, বৃহৎকে, নমস্যকে মানব না, পরস্পরের কাঁধে চ'ড়ে তার ওপর কাদা ছুঁড়বে—এই মনোবৃত্তি থেকে কোনও কল্যাণ আসতে পারে না।

আমরা সব রকম চেষ্টা করেই দেখেছি। আমি নিজে হাতে-কলমে কাজ করেছি। ভাববিলাসীর স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ এ নয়। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে যে নূতন চেতনা আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাকে কাজে লাগাবার জন্যে আমরা কজনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কর্মসাগরে। সব দিকে গোড়া বেঁধে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। আমরা আস্ফালন করি নি, কাজ করেছিলাম। আমাদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় অনাহূতভাবে উচ্চ নীচ কত রকমের লোক যে এসে জুটতেন—তাঁদের সকলকে আমরা চিনতামও না। পথ খুঁজে বের করার সে কি ব্যাকুলতা! দেহচর্চার আখড়া হ'ল, দেশীয় শিল্প-প্রদর্শনী হ'ল ; আগেই বলেছি, স্বায়ত্তশাসনের খসড়া পর্যন্ত আমি নিজের হাতে প্রস্তুত করেছিলাম। সেটা যদি পাওয়া যেত তো দেখতে পেতে, আজকের দিনে যে যে বিষয় নিয়ে আমাদের সমস্যা জাগছে, তার প্রত্যেকটির সমাধান-চেষ্টা তার মধ্যে ছিল। নিজেরা পথে পথে বের হয়ে প্রচার করতাম। দেশও আশ্চর্য রকম সাড়া দিয়েছিল সেদিন। ন্যাশনাল ফাণ্ড গ'ড়ে তোলবার জন্যে যে মুহূর্তে আমরা জনসাধারণের কাছে আবেদন করলাম, সেই মুহূর্তেই তারা দলে দলে এসে উপযাচক হয়ে আমাদের থলি ভর্তি ক'রে দিয়ে গেল। দেবার জন্যে এই ঠেলাঠেলি—সেদিন বাঙালীর মধ্যে এরও অপূর্ব মূর্তি দেখেছি ; টাকা-আনা-পাইয়ের থলিতে গোপনে হাজার টাকার নোট এসেও পড়েছে। এই গেল এক দিক, অন্য দিকে চলেছিল আমাদের মিলনের সাধনা। সামনে যাকে পেতাম, তারই হাতে বাঁধতাম রাখি। সরকারী পুলিস এবং কন্স্টে-ব্‌লদেরও বাদ দিতাম না। মনে পড়ে, একবার একজন কন্স্টেব্‌ল হাতজোড় ক'রে বলেছিল, মাফ করবেন হুজুর, আমি মুসলমান। সরকারের চরেরা ওত পেতে থাকত আনাচে-কানাচে, নির্যাতনলাভও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে। আমরা দমি নি, কারণ আমাদের আদর্শ ছিল বড়। এই সময়ে আমার সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশাই। তাঁর সঙ্গে সব

বিষয়েই আমার মতের মিল ছিল না। কিন্তু অকারন বিদ্বেষবুদ্ধি কখনও আমাদের হৃদ্যতার সম্পর্কে ছেদ ঘটাতে পারে নি। এমন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আমি আর দ্বিতীয় দেখি নি। আরও ছিলেন অনেকে; শিল্প সাহিত্য সমাজ রাষ্ট্র—একসঙ্গে চতুর্দিকে আমাদের জয়রথ ছুটিয়েছিলাম।

তারপর, একটা কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেমনই ঘটল, অমনই শুরু হল স্বার্থের সংঘাত। উচ্চতর আদর্শকে ঠেলে ফেলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বাঙালীর স্বভাব। অপঘাত ঘটতে বিলম্ব হল না। সেই মহৎ আদর্শকে আমরা আর ফিরে পাই নি। স্বার্থের পাঁকেই গড়াগড়ি দিয়ে মাতামাতি করেছি। সমগ্র দেশের সম্মিলিত চেষ্টায় যে কল্যাণ একবার চকিতে দেখা দিয়েছিল, মাটির অন্ধকারে কোথায় যে তা তলিয়ে গেল, আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথায় গেল সেই জাতীয় সমবায় ভাণ্ডার, কোথায় গেল স্বদেশের কল্যাণে উদ্যত সমবেত শক্তি!—সেই প্রচণ্ড স্বার্থবুদ্ধির সংঘাতে সে প্রশ্ন তোলবারও অবকাশ রইল না বাঙালীর।

এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে সেদিন যে সুযোগ বাঙালী পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে ক্বচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোনও কাজে লেগেছে? যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলা দেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চ'ড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালীর এতদিনে অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। বাংলা দেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিষ্ফলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দেখ, আমার দেহ আজ অপটু, কিন্তু মন ছুটে চলেছে সেই পুরাতন কল্যাণের আদর্শ ধ'রে। ইচ্ছে করছে, আবার সকলের সঙ্গে মিলে কাজে লেগে যাই। তা আর সম্ভব হবে না। এই অক্ষমতার বেদনা নিয়েই আমাকে যেতে হবে। যদি পার, আমাদের সেদিনের সেই বিলুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা কর। এই পুরাতন প্রশ্নপত্রগুলির মধ্যে সেই ইতিহাসেরই একটা ক্ষীণ সূত্র দেখতে পাচ্ছি। এর প্রয়োজন আজও মেটে নি। এগুলি প্রকাশ করতে পার।

* * *

মানুষ এবং কর্মী রবীন্দ্রনাথের সেই পরিচয় আমাদের চেষ্টা করিয়া জানিতে হইবে। সে অধ্যায় নিঃশেষে কাল-কবলিত হয় নাই। অধুনালুপ্ত 'ভাণ্ডার',

নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' ও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় এখনও কিছু সন্ধান মিলিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের বিবরণী-বহিতেও অনেক খবর আছে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূত্রপাতের ইতিহাসও চেষ্টা করিলে পাওয়া যায়। সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

১৩১২ সালের বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে তিনি রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলিয়া দেশোদ্ধারের কাজে নাম লিখাইয়াছিলেন। দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার বহুবিধ ভাবনা নানা প্রবন্ধের আকারে 'ভারতী', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'সাধনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল; এই জড়তাপ্রাপ্ত জাতির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য চৈতন্য-লাইব্রেরি, সাবিত্রী-লাইব্রেরি প্রভৃতির উদ্যোগে নানা সভা-সমিতিতে প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাও করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিকাংশই তাঁহার একক চিন্তা। সম্মিলিতভাবে কাজ করিবার ইচ্ছায় এই প্রথম তিনি আসরে নামিলেন। 'সূত্রধারের কথা'য় লিখিলেন —

> ···আমাদের এই সাধারণের কাজের মধ্যে কাজের ভাগ এতই অল্প যে, তাহাতে আমাদের দেশের মনকে তেমন করিয়া জাগাইয়া রাখিতে পারে না। কেবল ফুঁ দিলেই তো আগুন টেঁকে না, কাঠও চাই।···কবে যে ঠিকমত এই অবস্থার প্রতিকার হইবে তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের এই মানসিক উপবাস ঘুচাইবার চেষ্টা, যার যতটা সাধ্য করিতে হয়। ···একথা উঠিতে পারে যে, দেশে বড় বড় কাগজ পত্রের ত অভাব নাই, সে সব কাগজে নানাপ্রবন্ধ বাহির হয়, নানাকথার আলোচনা হইয়া থাকে।
>
> তাহা সত্য। কিন্তু সে সকল যেন একলার কথা। কোনটা বা সখের লেখা, কোনটা বা অনুরোধে পড়িয়া লেখা।···অধিকাংশই বানাইয়া লিখিতে হয়। সে সকল লেখার তাগিদ অন্তরের মধ্যে নাই।

ইহার পর হইতেই আমাদের দেশের জনসাধারণের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী নিয়মিত বাহির হইতে লাগিল, এবং 'ভাণ্ডারে'র "প্রশ্নোত্তর"-বিভাগে দেশের চিন্তাশীল ও কৃতী ব্যক্তিরা জাতিগঠন-বিষয়ক নানা সমস্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতার বিষয়গুলি হইতেই তাঁহার সে যুগের ভাবনার কিছু আভাস মিলিবে। তিনি "প্রাইমারি শিক্ষা" দিয়া সুরু করিয়াছেন এবং পর পর "স্বতিরক্ষা",

"বিজ্ঞানসভা", "স্বাধীন শিক্ষা", "বহুরাজকতা", "ইতিহাসকথা", "শিক্ষা-প্রচারক", "বঙ্গব্যবচ্ছেদ", "শোকচিহ্ন", "পার্টিশনের শিক্ষা", "করতালি", "দেশীয় নাম", "বিলাসের ফাঁস", 'রাজভক্তি", "স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন" প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়া জাতিকে জড়তার কবল হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছেন ; "রাখীবন্ধন", "বাউল" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলিও এই যুগেরই রচনা।

'শিক্ষার আন্দোলনে'র ভূমিকায় এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

শক্তি-লাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহা কেবল মাত্র খাদ্যলাভ নহে, বিদ্যালাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্ব লাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে, তখন সে ক্ষতি কোনো প্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিম্‌নি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল, সেই তার, সেই চিম্‌নির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র ; যখনি জাগ্রত হইব, তখনি সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্র প্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এদেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরও অনেকগুলি শক্তি আছে, যাহার উৎকর্ষসাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্টস্বীকারের অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত

না করি, এমন কি আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে মানবে কোনো দিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সেদিন বাঙালী যে অন্তত একবার আপনার স্বাধীন শক্তির প্রতিষ্ঠায় মাতিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং ইহার মূলে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা প্রভূত পরিমাণেই ছিল। ১৩১২ সালের আশ্বিন ও কার্তিক মাসে কলিকাতার 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী'তে, পটলডাঙা মল্লিকবাড়ির ছাত্রসভায় এবং আরও বহু স্থানে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে সকল সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেগুলির বিবরণী হইতে কর্মী রবীন্দ্রনাথের কিছু পরিচয় মিলিবে। সভায় গৃহীত প্রস্তাব ও তাঁহার বক্তৃতাগুলি হইতে সেদিনের রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি। ছন্দবিলাসী কবির মূর্তি তাহা মোটেই নয়।

কিন্তু কাজ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্ভাগ্যবশত যখন পরস্পর বিরোধ বাধিল, তখন রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিলেন। তাঁহার নিষেধকে উৎসাহের অভাব মনে করিয়া সেদিন অনেকে নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেদিনকার আন্দোলনের ফলাফল দেখিয়া মনে না করিয়া উপায় নাই যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বল মর্মস্থানটি সেদিন স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার সেদিনের সাবধান-বাণী আজ স্মরণীয়।—

> ···স্থায়ী মঙ্গল যে উদ্যোগের লক্ষ্য, আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। রাগারাগির ষ্টীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কি? গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।
>
> আজ যাহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন আমাদের এখনি আস্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোন মতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবল ক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোট হইতে বড় করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।... কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোন উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেই জন্য আরম্ভকে আমরা কেবলি বার বার আঘাত করিতে থাকি।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই অধৈর্য এবং অসহিষ্ণুতার মারাত্মক পরিণাম লক্ষ্য করিয়া যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন, সেদিন তাঁহার কথায় তাহারই প্রকাশ দেখিয়াছি। আমাদের স্বভাবের পরিবর্তন হয় নাই। বরঞ্চ আমরা উত্তরোত্তর পূর্বগামীগণের সাধনাকে নিষ্ফল করিবার কাজে বেশি করিয়া লাগিতেছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদের সাধনা আমাদের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিতে পারে। আমরা ইঙ্গিত মাত্র দিলাম।

যে প্রশ্নপত্রগুলি লইয়া এই আলোচনা, বাছাই করিয়া নিম্নে তাহার কয়েকটি মুদ্রিত করিলাম। আলোচ্য ক্যালেণ্ডারখানিতে তাঁহার রচিত সর্বসুদ্ধ চারিটি প্রশ্নপত্র আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদর্শ-প্রশ্নপত্ররূপে সেগুলির "অনুবাদ"-অংশ বাদ দিয়া পুনর্মুদ্রিত হইল।

Fifth Standard Examination, 1906

১। প্রবন্ধ-রচনা।

(ক) ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্তে সুরবনসম।

গোদাবরীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর, যেন তাহা স্বচক্ষে দেখিতেছ ; অর্থাৎ কুটীরের সম্মুখবর্তী নদীর তটভাগ কিরূপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায় কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবৎ লিখ।

অথবা (খ) পুরাণে বা ইতিহাসে যাঁহার চরিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা (গ) যে কোনও বাল্যপরিচিত প্রিয় আত্মীয় বন্ধুর বা পুরাতন ভৃত্যের বা পোষা প্রাণীর কথা ও তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া লিখ।

২। পত্র-রচনা।

নিম্নলিখিত যে কোনও বিষয় অবলম্বন করিয়া অভিভাবক বা বন্ধু বা যাঁহাকে ইচ্ছা পত্র লিখ।

(ক) 'মেস্' অর্থাৎ ছাত্রাবাসে কিরূপ ব্যবস্থা আছে এবং সেখানে কিরূপে দিন যাপন করা হয়।

(খ) বর্ত্তমান বৎসরে জলবায়ু ও •স্যাদি-ঘটিত পল্লীবাসীদের অবস্থা।

(গ) যে পাড়ায় বাস কর তাহার বর্ণনা।

৪। ব্যাখ্যা।

(ক) বর্ত্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো জাপানী লেখকের নিম্নলিখিত মন্তব্যের সরল ব্যাখ্যা কর :—

"জগতে যুদ্ধ কবে নিরস্ত হইবে? য়ুরোপে ব্যক্তিগত ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত আছে বটে, কিন্তু সেখানে জাতিসাধারণের ধর্ম্মবুদ্ধি সে পরিমাণে সচেতন হয় নাই। লুব্ধস্বভাব জাতিদিগের ন্যায়পরতা থাকিতে পারে না এবং দুর্ব্বলতর জাতিদের সহিত ব্যবহারকালে তাহারা বীরধর্ম্ম বিস্মৃত হয়। এ কথা চিন্তা করিতেও হৃদয়ে বেদনা লাগে যে আজিও বাহুবলই জগতে প্রধান সহায়। য়ুরোপে এ কি অদ্ভুত বৈপরীত্য দেখিতে পাই? একদিকে হাসপাতাল, অন্যদিকে লোকহননের নবনব কৌশল : একদিকে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক, অন্যদিকে রাষ্ট্রবিস্তারের বিপুল আয়োজন। শান্তি-রক্ষার উপায় সাধনের জন্য এ কি নিদারুণ অস্ত্রসজ্জা! এসিয়াখণ্ডের প্রাচীন সভ্যসমাজে

দিন এরূপ আদর্শ তাহার ছিল না এবং এই আদর্শের প্রতি অগ্রসর হওয়া তাহার বর্ত্তমান রাজনীতির লক্ষ্য নহে। এসিয়াকে দীর্ঘকাল যে মোহরজনী আচ্ছন্ন করিয়াছিল, জাপানের দিক্‌প্রান্তে তাহার আবরণ যখন কথঞ্চিৎ উন্মোচিত হইল, তখন দেখা গেল জগতের মানবসমাজ এখনো কুহেলিকায় আবিষ্ট। য়ুরোপ আমাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে, কবে সেই য়ুরোপ শান্তির কল্যাণ নিজে শিক্ষা করিবে।"

অথবা (খ) নিম্নোদ্ধৃত যে কোনো একটি কাব্যাংশ গদ্যে প্রকাশ কর। বাক্যগুলিকে পূর্ণতর করিবার জন্য আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন বা নূতন কিছু যোজনা করিলে অবিহিত হইবে না।

(১) (যজ্ঞশালায় গোপনে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণের দ্বারা আক্রান্ত নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে দ্বাররোধ করিতে দেখিয়া কহিলেন)

"হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, শূলী শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র রাঘববিজয়ী?
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?"
উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে একথা, তাত, কহ তা দাসেরে।

* * *

কেবা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
তবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে?"

(২) (কলিঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি)

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমেষেকে ঝাঁপে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
কলিঙ্গে থাকিয়া মেঘ করে ঘোর নাদ।
প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ॥

* * *

করিকর-সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার, পথ হৈল হারা।
ঘন বাজধ্বনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনো জন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জনক জননী॥
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভাসি বুলে জলে।
নাহিক নির্জ্জন স্থান কলিঙ্গ নগরে॥

* * *

মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রমাসেতে যেন পড়ে পাকা তাল॥

* * *

চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উড়ি পড়ে ঘর গোলা করে দোলমাল॥

Seventh Standard Examination, 1906

১। প্রবন্ধ-রচনা।

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি রচনার মধ্যে যে কোনটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) সঞ্চয় ও সঞ্চার।

শক্তিসঞ্চয় যে প্রকার আবশ্যক, তাহার বিকীরণও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক। হৃৎপিণ্ডে রুধিরসঞ্চয় অত্যাবশ্যক ; তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু। কুলবিশেষ বা জাতিবিশেষে সমাজের কল্যাণের জন্য বিদ্যা বা শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া এককালের জন্য অতি আবশ্যক, কিন্তু সেই কেন্দ্রীভূত শক্তি কেবল সর্বতঃ সঞ্চারের জন্য পুঞ্জীকৃত। যদি তাহা না হইতে পারে, সে সমাজশরীর নিশ্চয়ই ক্ষিপ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(খ) শিক্ষার উদ্দেশ্য।

And the entire object of true education is to make people not merely *do* the right things, but *enjoy* the right things :—not merely industrious, but to love industry— not merely learned, but to love knowledge—not merely pure, but to love purity—not merely just, but to hunger and thirst after justice.

অথবা (গ) রাম ও লক্ষ্মণের চরিত্র তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখ।

২। পত্র-রচনা।

নিম্নলিখিত যে কোনো বিষয় অবলম্বন করিয়া পত্র লিখ :—

(ক) জীবনের কোনো একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার বিবরণ।

(খ) জীবিকা অর্জন ও জীবনের লক্ষ্যসাধন সম্বন্ধে যে শিক্ষা ও যে পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা কর অভিভাবককে তাহার জ্ঞাপন।

৪। নিম্নোদ্ধৃত (ক) ও (খ) দুইটি কাব্যাংশের মধ্যে যেটি ইচ্ছা গদ্যে প্রকাশ কর। গদ্য রচনারীতির প্রয়োজনানুসারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও নূতন যোজনা অসঙ্গত হইবে না।

(ক) (কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর মৃত দেহ)

দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।

... ...

আদর্শবীরত্ববক্ষে প্রীতির প্রতিমা !

(খ) (কালকেতুর নিকট ভাঁড়ু দত্তের আগমন)

ভেট লয়া কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা

... ...

কেহ নাহি করয়ে বন্ধন ॥

Fifth Standard Examination, 1907

১। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য-শাসন ও অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।"

সমস্ত সমাসগুলি ভাঙিয়া উল্লিখিত বাক্যটিকে লিখ।

অথবা—সমাস ব্যবহার দ্বারা ও সর্ব্বপ্রকারে নিম্নলিখিত বাক্যটিকে সংহত কর :—

যাহার হৃদয় সরল, যাহার আচার শুদ্ধ, পতিই যাঁহার প্রাণ এমন স্ত্রীলোককে, কোনো অপরাধ করেন নাই জানিয়াও, যখন আমি অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন এমন কে আছে যে আমা অপেক্ষা মহাপাতকী।

২। সীতার বনবাস গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাটিকে অল্প কয়েক ছত্রের মধ্যে লিখ। অথবা—পুরাণে গঙ্গার উৎপত্তিসম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহার সহিত কবি হেমচন্দ্রের বর্ণনার কি প্রভেদ দেখাইয়া দাও।

৪। (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্নগুলির মধ্যে যে কোন দুইটির উত্তর লিখ।

(ক) "পড়ে থাকে দূরাগত
জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।"

মনের কিরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত উপমাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।

অথবা—

হাস্‌রে শরৎ চাঁদ কিরণ বিস্তারি
পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি।

এই বর্ণনাটি ফলাইয়া লিখ।

(খ) পল্লীগ্রামে অন্ধকার রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল ; বিধবা স্ত্রীলোকের

রুগ্ন ছেলেটির জন্য ডাক্তার ডাকিবার কোনো লোক নাই জানিয়া অবিনাশ ভীতস্বভাব হইলেও ভয় সম্বরণ করিয়া ডাক্তারের বাড়ী গেল।

এই ঘটনাটিকে বর্ণনা করিয়া লিখ।

অথবা—

কলিকাতার অথবা পরিচিত কোনো গ্রাম বা সহরের কোনো একটি পথের কিয়দংশ যথাযথরূপে বর্ণনা কর।

(গ) মনে কর একশো টাকা লাভ করিয়াছ, এই টাকা লইয়া কি করিতে চাও, তাহা বন্ধুকে জানাইয়া লিখ।

অথবা—

তোমার পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টা তোমার বিশেষ ভাবে ভাল লাগে বা লাগে না, তাহার আলোচনা করিয়া পত্র লিখ।

(ঘ) কবি হেমচন্দ্রের যে কবিতা তোমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে, তাহার ভাষা, ছন্দ ও কবিত্ব বিচার কর। (কবিতাবলী দেখিয়া লিখিতে পার)

৫। নিম্নোদ্ধৃত অংশ সরল ভাষায় লিখ—

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতাসহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—'হে দাশরথে, ধর্মচারিণী এই সীতা লোকাপবাদ-হেতু আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। এই অপাপা পতিপরায়ণা তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন।' রাম বাল্মীকিকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জানকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক, জনগণের সমক্ষে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য। আপনার পবিত্র বাক্যেই আমার প্রত্যয় হইতেছে। এই জানকীকে আমি পবিত্রা মনে জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।" তখন কাষায়বস্ত্রপরিধানা সীতা সকলকে সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, "আমি রাম ভিন্ন জানি না, আমার এই বাক্য যদি সত্য হয়, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।" বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে দিব্য সিংহাসন সহসা রসাতল হইতে আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী সীতাকে দুই বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন।

সিংহাসনারূঢ়া সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

অথবা—

নিম্নলিখিত কাব্যাংশ গদ্য করিয়া লিখ :—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিত
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনকদুহিতা
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ
দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ,
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার॥

উল্লিখিত কবিতার তৃতীয় ছত্রে চিন্তান্বিতা শব্দটি কাহার বিশেষণ?

Seventh Standard Examination, 1907

১। (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) চিহ্নিত প্রশ্ন চারিটির মধ্যে যে কোনো দুইটির উত্তর লিখ।

(ক) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কিহে তোমার ভূষণ
রত্নাকর? কোন্ গুণে কহ, দেব, শুনি,
কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?

প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি, প্রভঞ্জনসম
ভীম পরাক্রমে! কহ এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে,
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী.
কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখোনা গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

উল্লিখিত কাব্যাংশকে গদ্য কর। যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ পরিত্যাগ করিয়া ভাষা সরল করিতে হইবে।

(খ) অনিন্দ্য, পেলব, ক্ষুদ্র অবয়ব;
অনিন্দ্যসুন্দর কোমল আস্য,
ক্ষুদ্রকণ্ঠে তোর কলকণ্ঠরব;
ক্ষুদ্রদন্তে তোর মোহন হাস্য,
কচি বাহু দুটি প্রসারিয়া ছুটি'
আসিস্, ঝাঁপিয়া আমার বক্ষে;
ক্ষুদ্র মুষ্টি তোর ক্ষুদ্র করপুটে,
দুষ্ট দৃষ্টি তোর উজ্জ্বল চক্ষে;
ক্ষুদ্র দুটি ওই চরণ-বিক্ষেপে,
কক্ষ হতে কক্ষান্তরে প্রলম্ফ;
ধরিয়া আমার অঙ্গুলিটি চেপে,
সোপান হইতে সোপানে ঝম্ফ।

উহ্য শব্দগুলির পূরণ করিয়া উল্লিখিত কাব্যাংশটিকে গদ্যে লিখ।

(গ) যথাসম্ভবরূপে সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিত গদ্যকে সরল কর :

"সূর্য্যমুখী পূর্ণ চন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শিভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লব-রেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি, সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিতলতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে।"

৩। মধুসূদন তাঁহার কাব্যের ভাষায় কোনও নূতন প্রথা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং সে প্রথা পরবর্ত্তী কাব্যে প্রচলিত হইয়াছে কিনা?

৪। মেঘনাদবধ ও বৃত্রসংহারের ছন্দ, ভাষা ও কাব্যরীতির তুলনা করিয়া আলোচনা কর। (গ্রন্থ দেখিয়া লিখিতে হইবে)।

অথবা -

অক্ষয়কুমারের সহিত বিদ্যাসাগরের রচনাসম্বন্ধে কি পার্থক্য তাহা আলোচনা কর।

৬। সাধারণতঃ এদেশে যেরূপ নিয়মে ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে হয়, তাহার কোনো পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় কি না, ছাত্রগণ কি পরিমাণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে, এরূপ উপায়ে তাহার যথার্থ পরীক্ষা হয় কি না তৎসম্বন্ধে আলোচনা কর।

অথবা—

মফঃস্বলের ছাত্রগণকে কলিকাতায় মেসে থাকিতে হইলে সুবিধা অসুবিধা কি কি বিপদ কি ঘটে তাহার বিচার কর।

৭। নিম্নলিখিত কোনো একটি বিষয় আলোচনা করিয়া বন্ধুকে পত্র লিখ :—

(ক) যে পল্লীতে বাস কর, তাহার উন্নতির জন্য ছুটির সময় তুমি কি করিতে ইচ্ছা কর।

(খ) শিক্ষার কাল অতীত হইলে নিজের স্বভাব ও সাধ্য অনুসারে দেশের হিতসাধনের জন্য তুমি কি কাজে কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে চাও।

ভাণ্ডারের কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে (১৩৪৬, অগ্রহায়ণ) রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই রবীন্দ্রজীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করিতে বসিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ পাঁচ মাইলব্যাপী অজগরের সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছিলাম, "তিনি শুধু দীর্ঘই হন নাই, বারম্বার ঋতু এবং যুগ অনুযায়ী খোলস পরিত্যাগ করিয়া নূতন মূর্তি ধরিয়াছেন, পূর্বাপর মিলাইয়া সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যকে চিনিয়া লওয়াও শক্ত।" উপকরণ সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকাকালে কবি রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া বিবিধ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার জবাব ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের ইংরেজী বাংলা যাবতীয় দৈনিক ও বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী প্রবন্ধ "কর্মী রবীন্দ্রনাথে" রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তব্য বিবৃত হইয়াছে। তাহার একটি অংশের পুনরুক্তি করিতেছি:

"দেশের জন্যে আমার যত কিছু ভাবনা, সুদূর বাল্যকাল থেকে যা আমার মনকে অবিরত আচ্ছন্ন করে ছিল, ছন্দোবদ্ধরূপেই শুধু তা প্রকাশ পায় নি। আমি বরাবরই সেই ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়েছি কাজে। এর জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলাম। আমার সর্বস্ব খুব বেশি ছিল না; যতটুকু ছিল, ততটুকুই নিঃশেষে উজাড় করে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছি। সমধর্মী ব্যক্তির সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব হয় নি। ভিক্ষাপাত্র হাতে খালি পায়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছি পথে পথে, দেশের লোকের প্রাণে সাড়া জাগাবার জন্যে দিনের পর দিন কত অজ্ঞাত অখ্যাত জায়গায় সভা করে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছি। এক মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না।...আমাদের কাজ ছিল কি? কি ছিল না, তাই ভাবি। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে দৃষ্টি ছিল আমাদের। দেশীয় বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় সমবায় ভাণ্ডার পর্যন্ত সব কিছুরই পত্তন করেছিলাম। শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার চেষ্টা তো ছিলই, পল্লীমঙ্গল, পল্লীসংগঠন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার, কুটীরশিল্প ও কলকারখানার সাহায্যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের যাবতীয় দ্রব্য নির্মাণ—আমরা করিনি কি?"

বস্তুত, যুগে যুগে খোলস পরিবর্তন করিলেও পরাধীন আত্মনির্ভরতাহীন

দেশের জন্ত একটি দুশ্চিন্তাবোধ ও কল্যাণসাধনের আগ্রহ তাঁহার প্রথমতম রচনা (নবেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮৭৪, বয়স সাড়ে বারো) হইতে তাঁহার জীবনে প্রায় শেষ রচনা পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। একটা গভীর দেশাত্মবোধ ফল্গুর মত তাঁহার অন্তরের গভীর গহনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার জীবন ও কর্মকে বরাবরই নিয়ন্ত্রণ করিত। সমতলভূমির উপরে নদীপ্রবাহরূপে সেই ফল্গুধারা মাঝে মাঝে সকলের প্রত্যক্ষগোচরও হইয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে কয়েকটা বৎসর (১২৯৮ হইতে ১৩১৪) এই দেশপ্রীতির প্রবাহ উদ্দাম উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। এই কালের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ 'ভাণ্ডারে'র কাণ্ডারী ছিলেন।

গ্রহের ফেরে বারম্বার মাসিকপত্রের সম্পাদকত্ব করিতে হইলেও এই কাজটার প্রতি তিনি কোনকালেই প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। প্রায়ই বলিতেন, পূর্ব-জন্মের অনেক পাপের ফলে মানুষ—এই জন্মে মাসিকপত্রের সম্পাদক হয়। কিন্তু তাঁহার এমনই দুর্ভাগ্য যে, ফিরিয়া ফিরিয়া ছয়বার ছয়টি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকত্ব করিতে হইয়াছিল, সর্বপ্রথমে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বও পড়িয়াছিল তাঁহার স্কন্ধে। মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজী ভাষার পত্রিকাতেও সম্পাদকরূপে তাঁহার নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। মাতৃভাষায় পত্রিকা সম্পাদন-পরিচালনের কালানুক্রমিক তালিকা নীচে দিলাম।

১। হিতবাদী, সাপ্তাহিক ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮, প্রথম সংখ্যা হইতে কয়েক সপ্তাহ রবীন্দ্রনাথ ইহার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই একটি পত্রে জানা যায়, "কৃষ্ণকমলবাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে।" অবশ্য তাঁহার নাম ছাপা হয় নাই।

২। সাধনা, ৪র্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্তিক ১৩০২। সম্পাদক। 'সাধনা' মাত্র চারি বৎসর জীবিত ছিল। প্রথম তিন বৎসর ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সম্পাদক হিসাবে থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই সম্পাদন করিতেন।

৩। ভারতী, ২২শ বর্ষ, ১৩০৫, সম্পাদক।

৪। ভাণ্ডার, ১ম, ২য় বর্ষ সম্পূর্ণ, ৩য় বর্ষ বৈশাখ-আষাঢ় অর্থাৎ ১৩১২ বৈশাখ হইতে ১৩১৪ আষাঢ় পর্যন্ত দুই বৎসর তিন মাস। সম্পাদক।

৫। বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়, ১ম—৫ম বর্ষ, ১৩০৮—১৩১২ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক। ষষ্ঠ বর্ষ হইতে সহকারী শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক হন।

৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৮—২১ বঙ্গাব্দ, চারি বৎসর। সম্পাদক।

পত্রিকা-সম্পাদন প্রসঙ্গে চিঠিপত্রে ও পত্রিকাগুলির সম্পাদকীয় নিবেদনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে সকল খবর দিয়াছেন তাহা যথাক্রমে এই :

১। 'হিতবাদী' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিয় সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিয়াছেন :

> বঙ্কিম রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন। যাই হোক্, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাকবে। তোমাকে এই সঙ্কটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্চে। গুটিকতক বেশ ছোট ছোট লঘুপাঠ্য সাহিত্য-প্রবন্ধ পাঠাতে হচ্চে।—যত ছোট হয় তত ভাল অতএব সময়াভাবের ওজর ঠিক খাটবে না। 'বালকে' তুমি যেমন "বসন্ত উৎসব" "পাঠশালা" প্রভৃতি পাড়াগাঁয়ের চিত্র দিয়েছিলে সেগুলি বড় ভাল জিনিষ হয়েছিল কিন্তু আমি তোমাকে ফরমাস করতে চাইনে। তুমি তোমার কর্ম্মস্থানেরও চিত্র দিতে পার কিম্বা যা ইচ্ছা লিখতে পার। এই প্রসঙ্গে আর একটা খবর দেওয়া আবশ্যক—লেখকেরা কাগজের অংশ থেকে কিছু পরিমাণ পারিতোষিক পাবেন।

সম্ভবতঃ, পত্র-পত্রিকায় লেখকদের নিয়মিত দক্ষিণার ব্যবস্থা এই প্রথম।

রবীন্দ্রনাথের দেনাপাওনা, গিন্নী, পোষ্টমাস্টার, তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি, ব্যবধান ও রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা এই ছয়টি গল্প 'হিতবাদী'তে বাহির হয়। তাঁহার পরিচালনায় এই সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহিত্য-বিভাগ এমন সমৃদ্ধ হইয়া উঠে যে সংবাদপত্র হিসাবে ইহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় চন্দ্রনাথ বসুর রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় তারিখের একটি পত্রে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "হিতবাদীর মঙ্গলকামনা করি। কিন্তু হিতবাদী newspaper-এর হিসাবে এ পর্য্যন্ত ভাল হইতেছে না। রাজনৈতিক প্রবন্ধের স্বল্পতা এবং যাহা থাকে তাহাও ভাল লেখা হইতেছে না। সাহিত্যিক অংশ বড় বেশী হইতেছে। সাহিত্যিক অংশ অত বেশী হইলে কাগজ জাঁকিবে না বলিয়া বোধ হয়। এ কথাটা খালি তোমাকে বলিলাম।"

২। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা' বাহির হয়, সম্পাদক ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ বিরাহিমপুরে জমিদারী-তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত। সেখান হইতে এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা একখানি চিঠিতে দেখিতেছি :

> সাধনার প্রথম সংখ্যা কি তোমার হস্তগত হয়েছে? আমার ত সবসুদ্ধ মন্দ লাগল না। কিন্তু এর আরো উন্নতিসাধন করা আবশ্যক—আমি রাজধানীতে ফিরে একবার ঐদিকে মনোযোগ করব। আসল কথা, একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের ক'চেন। একে ত বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয় তার পরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দয্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে। তুমি কি রাজকায্যে এমনি মগ্ন হয়ে গেছ যে রাজদণ্ড ছেড়ে লেখনী ধরবার অবসর নেই? একটু আধটু লিখো। সাধনায় কেবলই ঠাকুরের নাম ভাল দেখ্‌তে হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাকে লেখাতে অনেক সাধনা চাই, এবং সে সাধনাও সিদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ। তুমি কি উড়িষ্যাকে একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে বাঙ্গলার দিকে মনোযোগ করবে না?

পাতা হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে প্রথম সংখ্যার ৯২ পৃষ্ঠার মধ্যে ৪০ পৃষ্ঠাই রবীন্দ্রনাথের লেখা। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া 'সাধনা'য় তাঁহার লেখার পরিমাণ বাড়াইয়া দেন এবং প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই এক একটি গল্প প্রকাশ করিতে থাকেন। এইভাবে পুরাপুরি হাল ধরিয়া প্রথম তিন বৎসরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্পাদকের গৌরব দিয়া তিনি চতুর্থ বৎসরে হঠাৎ কেন যে নিজেই সম্পাদক হিসাবে নাম দিলেন সে রহস্য আমরা উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই। রচনার দিক দিয়া 'সাধনা' যে উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিল চতুর্থ বৎসরের শেষের দিকে সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে সে উচ্চতা বজায় রাখা ক্লেশকর হইতেছিল। সুতরাং পঞ্চম বৎসরের পত্রিকা আর বাহির হয় নাই।

৩। 'ভারতী'র জন্মকালে (শ্রাবণ ১২৮৪) হইতে প্রথম কুড়ি বৎসর

রবীন্দ্রনাথের লেখা সর্বাধিক হইলেও ১৩০৪ সাল পর্যন্ত তিনি সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই; ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে সম্পাদকীয় জোয়াল স্বেচ্ছায় কাঁধে লইলেন। এই সময়েই তাঁহার সৃজনীপ্রতিভা সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। এই বৎসরের 'ভারতী'তে মোট প্রায় ১২০টি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৫৬টিই রবীন্দ্রনাথের লেখা। সুতরাং ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সম্পাদক বর্ষশেষে "সম্পাদকের বিদায়গ্রহণ" লিখিয়া এই কঠিন দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তৎপূর্বে "বিদায় কাল" কাবিতায় লিখিলেন—

"ক্ষমা কর, ধৈর্য্য ধর, হউক সুন্দরতর
বিদায়ের ক্ষণ।
মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়,
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলা শ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।
. ...
হে মহাসুন্দর শেষ! হে বিদায় অনিমেষ!
হে সৌম্য বিষাদ!
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির মুছায়ে নয়ন-নীর
কর আশীর্ব্বাদ!
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির। পদতলে নমি শির
তব যাত্রাপথে,
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি
নিস্তব্ধ জগতে!"

১০ই চৈত্র, ১৩০৫

"সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ" কবির সম্পাকদীয় কর্মের কৈফিয়ত স্বরূপ উদ্ধারের যোগ্য।

"সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ

এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে সকল ত্রুটির যতকিছু কৈফিয়ৎ প্রায় সমস্তই

ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়া কর্ম্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্ম্মা হইয়া কর্ণধারের মত পত্রিকার চূড়ার উপর সর্ব্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মত কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মত,—সমস্ত দিন ক্ষেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া যোগান দিতে হয়;—তাহাতে পরমধৈর্য্যবান জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।

ধনীপল্লীতে যে দরিদ্র থাকে তাহার চাল খারাপ হইয়া যায়। তাহার ব্যয় ও চেষ্টা আপন সাধ্যের বাহিরে গিয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই—অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প—অথচ চাল বিলাতী, নিয়ম অত্যন্ত কড়া;—সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।

ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই, সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্ম্মবশতঃ কম্পোজিটরের রোগতাপও ঘটে এবং প্লেগের গোলেমালে ঠিকা লোক পাওয়ায় দুর্লভ হয়।

যে ব্যক্তি পত্র চালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই সকল বাধা বিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার দ্বারা পূরণ করিবার মত যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মত অসামান্য ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক

কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাতুদ্বাহু বামনের চেষ্টার মত হয়। ফলও যে নিরবচ্ছিন্ন মিষ্টস্বাদ এবং লোভের কারণও যে অত্যধিক তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। আশা করি এই ফলের যাহা কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে দিয়াছি, এবং যাহা কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে নিজে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এ সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোন কার্য্যে ব্রতী হন না,—আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু ঘূর্ণা-বাতাসের মত যখন কর্ম্মের আবর্ত্ত ঘেরিয়া ফেলে তখন ধূলায় বেশী দূর দেখা যায় না এবং তাহার আকর্ষণে অসাধ্য স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়।

উপদেষ্টা পরামর্শদাতাগণ অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধ ভাবে বলিয়া থাকেন একবার প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভাল দেখায় না। এ প্রসঙ্গে জনসনের একটি গল্প মনে পড়ে। একদা জনসন পার্শ্বে কোন মহিলাকে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। না জানিয়া হঠাৎ এক চামচ গরম সূপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিঃক্ষেপ করিলেন—এবং পার্শ্ববর্ত্তিনী ঘৃণাসঙ্কুচিতা মহিলাকে কহিলেন, "ভদ্রে, কোন নির্ব্বোধ হইলে মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ফেলিত।" গরম সূপ যে ব্যক্তি একেবারেই লয় না সেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি লইয়া লজ্জার অনুরোধে গিলিয়া ফেলে, সর্ব্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাহাই হোক, সম্পাদন কার্য্যের ত্রুটি উপলক্ষ্যে যাঁহারা আমাকে মার্জ্জনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদের নিকট আর অধিক অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। এবং সম্পাদক পদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহত্তার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইতি"

৫। কালানুক্রমিক তালিকায় 'ভারতী'র পরেই 'বঙ্গদর্শনে'র নাম।

ভ্রমক্রমে এই গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় 'ভাণ্ডার'কে চতুর্থ স্থানে বসাইয়াছি। 'ভারতী'-সম্পাদনের অভিজ্ঞতার পর 'বঙ্গদর্শন [নবপর্যায়ে]'-এর ভার রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই লইতে চাহেন নাই। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু ঘনিষ্ঠ সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে আবার সম্পাদকীয় যূপকাষ্ঠে মাথা গলাইতে হইয়াছিল। বঙ্কিম-সঞ্জীবচন্দ্রের আমলেই এই পত্রিকার পরিচালন-ভার শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল কিন্তু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া তিনি প্রথম পর্যায় 'বঙ্গদর্শন' মাত্র কয়েক সংখ্যা চালাইতে পারিয়াছিলেন। এই ব্যর্থতার গ্লানিমুক্ত হইবার জন্য শ্রীশচন্দ্র ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শেষাশেষি পুনরায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-উত্তরাধিকারী রবীন্দ্রনাথই হইতে পারেন শ্রীশচন্দ্রের এই দৃঢ়মত শেষ পর্যন্ত খণ্ডন করিতে না পারিয়া রবীন্দ্রনাথকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। "সূচনা"য় (১৩০৮, বৈশাখ, পৃ. ১-৪) লেখেন:

"...অধুনা বঙ্গদেশে যে কেহ সুলেখক আছেন, বঙ্গদর্শন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া ঐতিহাসিক সূত্রে বঙ্কিমের কালের সহিত গ্রথিত করিয়া লইবে, ইহা বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালী লেখকদিগের পক্ষে প্রার্থনীয় বলিয়া আমরা মনে করি। কালের সহিত কালান্তরের যোগসূত্র যতই দৃঢ় হইবে, ভাবের পথ ততই সুদূর বিস্তৃত এবং সাহিত্যের আদর্শ ততই প্রশস্ত হইতে থাকিবে। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন যদি কেবল বঙ্কিমের কালের মধ্যেই স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, জীবিতকালের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তবে স্বভাবের নিয়মে তাহা কালক্রমে ধূলিসমাচ্ছন্ন ইতিহাসের বিবরমধ্যে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহারের অতীত হইয়া যাইবে। মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে। যাঁহারা জাতিগত মাহাত্ম্যের প্রার্থী, তাঁহারা সেইরূপ কোন যোগসূত্রকেই নষ্ট হইতে দিতে চাহেন না। তাঁহারা অতীতকে ভবিষ্যতের সহিত আবদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবনের লীলাভূমিকে সুবিস্তীর্ণ করিবার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করেন। বঙ্গ-দর্শনকে বহন করিয়া চলাও বঙ্গ-সাহিত্যকে অপরিচ্ছিন্ন ও প্রশস্ত রাখিবার একটি উপায়।

এই সূত্রযোগে বঙ্গসাহিত্যের যদি একটি মালা গাঁথা যায়, তবে তাহা

ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে না, বঙ্গলক্ষ্মীর কণ্ঠের চিরভূষণ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে, এক কালের সহিত অন্যকালের প্রভেদ অনিবার্য্য। যদিও দীর্ঘকালেব ব্যবধান নহে, তথাপি প্রথম বঙ্গদর্শনের কালের সহিত বর্ত্তমানকালের অনেক প্রভেদ হইয়াছে। সে প্রভেদ উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু সে প্রভেদ যে ব্যাপকতার দিকে, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তখন ইংরাজিরচনার দুরাকাঙ্ক্ষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রবল ছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠক অল্পই ছিল। সেই সঙ্কীর্ণ খাতের মধ্যে বঙ্কিম আপন প্রবল-প্রতিভা প্রবাহিত করিয়া সাহিত্যেব স্রোতঃপথকে গভীর ও ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার সেই নির্ঝর ধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্ব্বত্রই যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।

সঙ্কীর্ণ ধারার মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভাবের বেগ ও সৌন্দর্য্য সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হয়। আধুনিক সাহিত্যে আমরা প্রতিভার সেই ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রবলস্বাদ উপভোগ করিবার প্রত্যাশা আর করিতে পারিব না। এখন লেখক ও পাঠকের সংখ্যা গণিয়া উঠা কঠিন। এখন রচনা বিচিত্র, রুচি বিচিত্র। এখন লেখক-পাঠককের মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণীর বিভাগ ঘটিয়াছে। এখন সুলভ সংবাদপত্র প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া দূর-দূরান্তর হইতে অগণ্য পাঠক সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, এবং নব নব রঙ্গশালা নানা উপায়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া সাহিত্য-পণ্যকে নানাদলের চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব এখনকার বঙ্গদর্শন কোন উপায়েই তখনকার বঙ্গদর্শনের স্থান লইতে পারিবে না। এমন কি, এই বঙ্গদর্শন সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র হইবার আশাও করিতে পারে না। এই বঙ্গদর্শনের সম্পাদক বঙ্গদর্শনের আদি সম্পাদকের ন্যায় সমস্ত পত্রটিকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবের দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়া, লেখকদিগকে নিজের প্রতিভাবন্ধনে বাঁধিবার স্পর্ধা রাখেন না। এখন বঙ্গসাহিত্য অতি দূরবিস্তৃত। এখনকার

সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে, বর্ত্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে, চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্রমৃগ-তৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানা শক্তির দ্বারা নানা পথে আকৃষ্ট হইতেছেন। কালের বিরাট কণ্ঠস্বর নানা ক্ষুদ্র কোলাহলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আমরা একান্ত মনে আশা করি, বঙ্গদর্শন এই সকল সাময়িক কলকোলাহল হইতে নিজেকে সুদূরে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের আদর্শকে নিত্যকালের অচল শিখরের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

লোকমনোমোহিনী বহুমুখী প্রতিভার বলে বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠিত, মঙ্গলময়ের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে সে প্রতিষ্ঠা রক্ষিত হউক।'

'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন-দায়িত্বের গুরুত্ব ১৩০৮ সালেরই ২৪শে শ্রাবণ তারিখে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। 'বঙ্গদর্শন'-পরিচালনায় তাঁহার আদর্শের ইঙ্গিতও এই পত্রে আছে।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্মের মূল্য থাকে না—আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি—জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি

আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও। আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন্ জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে। তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal life, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ নির্ম্মূল হইয়াছে—সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতি সাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক্ আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে এ কথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশানাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইবে না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে বিলাত-প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে

রবীন্দ্রনাথ প্রথম কন্যা বেলার বিবাহ ও 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ-সংবাদ এইভাবে দিয়াছিলেন :

"বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ...বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে। আমাকে তাহার সম্পাদক করিয়াছে। মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয়দান করিয়াছেন। কন্যাকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন দিতে হইবে।"

৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশধরগণের অনেককেই কোনো না কোনো সময়ে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনভার লইতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল এই দায়িত্ব এড়াইয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৩১৮ সনের বৈশাখ হইতে পুরা চারি বৎসরের জন্য এই পত্রিকাকে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখপত্র করিয়া তুলিবেন মনস্থ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক হইলেন। ১৩১৭ সনের চৈত্র মাসে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে লেখা পত্রে দেখিতেছি :

"তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে।"

চারি বৎসরের পত্রিকাদৃষ্টে বুঝা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর স্কন্ধেই সমস্ত দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কয়েকটি ভাষণ ও কয়েকটি কবিতা-গান ছাড়া কোনও সৃষ্টিধর্মী রচনার দ্বারা এই চারি বৎসরের পত্রিকা গৌরবান্বিত হয় নাই।

পত্রিকা-সম্পাদনে 'ভাণ্ডার' সম্পাদনার কথাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, কারণ এখানে প্রথম বৎসরে তিনি একক ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) প্রমথনাথ চৌধুরী সহকারী সম্পাদকরূপে যোগ দেন। 'সাধনা'য় বলেন্দ্র-সুধীন্দ্রনাথ, 'ভারতী'তে সহোদর-সহোদরা ও আত্মীয়েরা, 'বঙ্গদর্শনে' শৈলেশচন্দ্র এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁহার সহায়ক ছিলেন। অবশ্য 'ভারতী' সম্পাদনও উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ওই এক বৎসরের পত্রিকাখানির বারো আনাই তিনি নিজের লেখা দিয়া ভরিয়া দিয়াছিলেন। তুলনামূলক আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ওই ১৩০৫ সালই সাহিত্যসৃষ্টির দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের জীবনে সর্বাধিক সফল বৎসর। পরবর্তী কালে 'সবুজ পত্র' সম্পাদনে প্রমথ চৌধুরীকে সাহায্য করিতে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির উৎসমুখ আর একবার অবারিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমাদের আলোচনার বিষয় 'ভাণ্ডারে'র কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১০ বৃহস্পতিবারের বার-

বেলায় 'ক্যালকাটা গেজেটে' বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট এবং কলিকাতা রাজধানী। কার্জন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতে আসেন। বৎসরাধিক কাল পরেই ১৯০১ সনের ২১ জানুয়ারী জনপ্রিয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। ১৯০২ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের বক্তৃতায় ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া কার্জন নিজের মুখোশ খুলিয়া ফেলেন। প্রতিবাদ আন্দোলন তখন হইতেই আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক। তাঁহার লেখনী মুখেই তীব্র প্রতিবাদের বান ডাকিতে থাকে। এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসরের মুখে প্রথম বঙ্গচ্ছেদ। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশের আকস্মিক পরাজয়ে সারা এশিয়া তখন শ্বেত-শাসনমুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছে। কাউণ্ট ওকাকুরা আসিয়া ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ১৯০২ সনের ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রশিষ্যা সিসটার নিবেদিতা বিপ্লবের বহ্নিরূপিণী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ধর্ম ছাড়িয়া স্বদেশ-প্রেম লইয়া মাতিয়াছেন। মোটের উপর যজ্ঞের উপকরণ সমস্তই প্রস্তুত।

এই কালে বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতায় কেদারনাথ দাসগুপ্ত নামে এক উৎসাহী যুবক ছিলেন, বক্তৃতা অপেক্ষা কাজের উপর তাঁহার আস্থা ছিল বেশি। বিলাতী বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য নির্মাণ ও প্রচার তাঁহার তদানীন্তন জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। এই সদুদ্দেশ্যে ৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন করা হইয়াছিল। তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন শুধু দেশী পণ্যের বিপণি খুলিলেই চলিবে না, দেশের লোককে স্বদেশীভাবাপন্ন করিবার জন্য সাহিত্য ও শিক্ষার মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিতও করিতে হইবে। এই কাজে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি তিনি দেশে দেখিতে পাইলেন না, কাজেই তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিতেছেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' হইতে 'ভাণ্ডার' পত্রিকা প্রকাশের সম্পাদকীয় দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথকে দিতে চাহিলে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র ওজুহাত দেখাইলেন, কিন্তু সে ওজুহাত টিকিল না। কেদারনাথের উৎসাহ তাঁহাতেও সঞ্চারিত হইল, তিনি 'ভাণ্ডারে'র কাণ্ডারী হইতে স্বীকৃত হইলেন। গোটা ১৩১২ বঙ্গাব্দটা তাঁহাকে সব্যসাচীর মতন ডানহাতে বাঁহাতে 'ভাণ্ডার' ও 'বঙ্গদর্শন' চালাইতে হইল। অবশ্য বাঁহাতের বা 'বঙ্গদর্শনে'র মুঠা তখনই

শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, ১৩১২ বঙ্গাব্দ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে লাগাম তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

'ভাণ্ডারে'র কাজও যে প্রথমটা তাঁহার প্রিয় ছিল না, তাহার প্রমাণ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট লিখিত পত্রে পাইতেছি। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ বোলপুর হইতে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "আপনি আবার কাগজের ফাঁদে ধরা দিতেছেন। সামলাইয়া উঠিতে পারিবেন ত? বড় ঝঞ্ঝাট, বিশেষত সাপ্তাহিক কাগজ। আমার স্কন্ধে 'ভাণ্ডার' বলিয়া এক কাগজ পড়িয়াছে দেখিয়াছেন ত? আমি যত মনে করি কাজের আবর্ত হইতে বাহির হইয়া পড়িব, ততই কাজ আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরে। কেন যে কি মনে করিয়া 'ভাণ্ডার' সম্পাদন করিতে রাজি হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাকেই বলে গ্রহ।"

১৩১২ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'ভাণ্ডার' রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বে আত্মপ্রকাশ করিল। মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "লেখকগণের প্রতি" সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের এবং "গ্রাহকগণের প্রতি।" প্রকাশক কেদারনাথ দাসগুপ্তের নিবেদন দুইটি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি—

১। 'কোনও ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা সম্পাদকের মত প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভাণ্ডার' প্রকাশ করা হইতেছে না। এই পত্রে দেশের মনস্বী কৃতী ব্যক্তিদের মত সম্পূর্ণ অপক্ষপাতের সহিত বাহির করা হইবে; দেশের লোককে সকল মতের সকল দিক বিচার করিবার অবকাশ দেওয়াই 'ভাণ্ডার' প্রকাশের উদ্দেশ্য, এই কথা মনে রাখিয়া লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া অসঙ্কোচে নিজের মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

সম্পাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

২। 'ভাণ্ডারের আয়তন ডিমাই আটপেজী চারি ফর্মা হইবে বলিয়াই আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছি, মূল্যাদিও (অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুলসহ ২৷৹, খুচরা সংখ্যা ।৹) তদনুরূপ নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এতগুলি সুখপাঠ্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ প্রথম সংখ্যার জন্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এবারে ভাণ্ডারের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হইয়া পড়িল।

সর্ব্বদা এমন সৌভাগ্য ঘটিবে, এ আশা করিতে সাহস হয় না।

প্রকাশক,

শ্রীকেদারনাথ দাসগুপ্ত'

আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ম্যানেজার এ. কে. সেনগুপ্ত, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র সহিত 'ভাণ্ডারে'র যোগাযোগটা ইহা হইতে বুঝা যাইবে—

"ভাণ্ডারের গ্রাহকদিগের বিশেষ সুবিধা

প্রতি মাসে তিনটি জিনিসের নাম ও মূল্যের তালিকা ভাণ্ডারে প্রকাশিত হইবে ; গ্রাহক তাহার মধ্যে যে জিনিষ পছন্দ করিবেন, আমরা তাহা বাজার দর হইতে প্রতি টাকায় ৴১০ পয়সা ন্যূন মূল্যে দিব। সর্বশুদ্ধ দুই টাকার অধিক দামের জিনিষ কোনও এক মাসে দেওয়া যাইবে না। যদি প্রতি মাসেই ২ টাকার জিনিষ লন, তবে মাসিক ৵০ আনা হিসাবে বৎসর ২।০ বাদ পাইবেন ; এই উপায়ে গ্রাহকগণ 'ভাণ্ডার' এক প্রকার বিনা মূল্যেই পাইতে পারিবেন। এইরূপে আমাদের ব্যয়ে দেশীয় জিনিষের কিঞ্চিৎ পরিমাণে কাটতি বৃদ্ধি হইতে পারে ভাবিয়া আমরা এই গুরুতর অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়াছি ; সুতরাং আপাততঃ নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাহককে আমরা এইভাবে দিতে পারিব। অতএব যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, সত্বর হউন।

১৩১২ সালের বৈশাখ মাসের জন্য নিম্নলিখিত জিনিষ দেওয়া হইতেছে—

১। এরিয়ান হোজিয়ারির মোজা।

২। বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরির সাবান।

৩। পাইওনিয়ার কণ্ডিমেণ্ট কোং-র চাটনি ও সিরাপ ইত্যাদি

এ. কে. সেনগুপ্ত

ম্যানেজার, ৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।"

সওয়া দুই বৎসরের 'ভাণ্ডারে' রবীন্দ্রনাথের বহু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা, কবিতা ও গান প্রকাশিত ও 'রচনাবলী' ভুক্ত হইয়াছে, কিছু লেখা এখনও 'ভাণ্ডারে'র পৃষ্ঠাতেই থাকিয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস শ্রীপুলিনবিহারী সেন সেগুলিও 'রচনাবলী'ভুক্ত করিবেন। 'ভাণ্ডারে' গল্প উপন্যাস রম্য-ও-রস-রচনা, ব্যঙ্গ হাস্যকৌতুক একেবারেই স্থান পায় নাই, কারণ ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল স্থির, এককথায় বলা যাইতে পারে, দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য দেশের সুপ্ত চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করা। প্রথম বৎসরের 'ভাণ্ডারে' রবীন্দ্রনাথ লিখিত নিম্নলিখিত রচনাগুলির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত—

বান—এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে	ভাদ্র ও আশ্বিন
একা—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	ঐ
মাতৃমূর্তি—আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে	ঐ
মাতৃগৃহ—মা কি তুই পরের দ্বারে	ঐ
প্রয়াস—তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	ঐ
বিলাপী—ছি ছি, চোখের জলে ভিজাস নে	ঐ
বাউল—(১) যে তোরে ছাড়ে ছাড়ুক	ঐ
(২) যে তোরে পাগল বলে	ঐ
(৩) ওরে তোরা নেই বা কথা বললি	ঐ
(৪) যদি তোর ভাবনা থাকে	ঐ
(৫) আপনি অবশ হলি তবে	ঐ
(৬) জোনাকি, কি সুখে ঐ ডানা দুটি	ঐ
রাখী সঙ্গীত (১) বাংলার মাটি, বাংলার জল	ঐ
(২) ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে	ঐ
(৩) বিধির বাঁধন কাটবে তুমি	ঐ
গান—ওরে ভাই মিথ্যা ভেব না	কার্তিক
বিলাসের ফাঁস—প্রবন্ধ	মাঘ
রাজভক্তি—প্রবন্ধ	মাঘ
পূজার লগ্ন—এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা	ফাল্গুন

এতদ্ব্যতীত প্রথম বৎসরে প্রবন্ধ নিবন্ধ আলোচনা—রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই আছে, যাহার কয়েকটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইতিহাসে এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দুই একটি সাময়িক পত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা এখানে পুরা তালিকা দাখিল করিতেছি :

সূত্রধারের কথা	বৈশাখ
প্রাইমারি শিক্ষা	ঐ
স্মৃতিরক্ষা	ঐ
আজকালকার পব্লিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?	জ্যৈষ্ঠ
বিজ্ঞান সভা	ঐ
জাপানের প্রতি	আষাঢ়

স্বাধীন শিক্ষা	ঐ
বহুরাজকতা	ঐ
ইতিহাস কথা	ঐ
শিক্ষা প্রচারক	ঐ
বঙ্গব্যবচ্ছেদ	ভাদ্র-আশ্বিন
শোকচিহ্ন	ঐ
পার্টিশনের শিক্ষা	ঐ
করতালি	ঐ
দেশীয় নাম	ঐ
স্বদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়	ঐ
উদ্বোধন	কার্তিক
স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন	ফাল্গুন

উপরের প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সূত্রধারের কথা, স্মৃতিরক্ষা, স্বাধীন শিক্ষা, বহুরাজকতা, ইতিহাস কথা, শিক্ষা প্রচারক, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ, শোকচিহ্ন, পার্টিশনের শিক্ষা, করতালি, দেশীয় নাম, স্বদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায় ও উদ্বোধন। 'স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন'—সে যুগের সকল দেশসেবকের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইত, ইহা ঠিক মন্ত্রের মত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ব্যবহৃত হইত। মন্ত্রটি পুনরুচ্চারণ করিতেছি :

'বাংলা দেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্যরূপে ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অত্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র

কালিমাপাত না করিয়া বার বার স্বর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দে মাতরম্।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

যদিচ 'ভাণ্ডারে'র কাণ্ডারী রবীন্দ্রনাথই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকাশক কেদারনাথ দাসগুপ্ত প্রথমটা ঠেলিয়া নৌকা জলে নামাইয়াছিলেন, কেন, কি উদ্দেশ্য লইয়া সে কথা 'সূত্রধারের কথা'তেই রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছেন :

"'ভাণ্ডার' প্রকাশের উদ্দেশ্য কি কি আছে, সর্বপ্রথমেই খোলসা করিয়া তাহার একটি ফর্দ দিবার জন্য প্রকাশক মহাশয়েরা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, কারণ উদ্দেশ্য জানাইয়া কাজ আরম্ভ করাই দস্তুর।

কিন্তু পাঠকদিগকে আমি আশ্বাস দিয়া বলিতেছি যে, যদিও আমি সম্পাদক, তবু আমার মনে কোন প্রকার স্পষ্ট রকমের উদ্দেশ্য নাই। সাধু উদ্দেশ্যের উৎপীড়নে যাহারা পৃথিবীকে এক মুহূর্ত স্থির হইতে দিতেছে না, আমি তাহাদের দলে নাম লিখাইতে প্রস্তুত নই।

তবে আমি এই কাগজ সম্পাদনের কাজে ধরা দিলাম কেন—একথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার জবাব এই যে, ব্যাধের বাঁশি শুনিয়া হরিণ যে কারণে ধরা দেয়, আমারও সেই একই কারণ। অর্থাৎ তাহা কৌতূহল, আর কিছুই নহে।

দেশের যে সকল লোক নানা বিষয়ে নানারকম ভাবনা চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ভাবিতেছেন জানিবার যদি সুযোগ পাওয়া যায়, তবে মনে ঔৎসুক্য না জন্মিয়া থাকিতে পারে না।

প্রকাশকের মুখে যখন জানিতে পারিলাম, আমাদের এই কাগজটাতে একটা মানসিক সামাজিকতা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে, দেশের পাঁচ জন ভাবুককে একটা বৈঠকে আমন্ত্রণের উদ্যোগ হইতেছে, তখন কৌতূহলে আমার মন আকৃষ্ট হইল।"

আসলে এই ভাবুকদের বৈঠকই হইল 'ভাণ্ডারে'র আসল বৈশিষ্ট্য। "প্রকাশকের নিবেদনে" তাহা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—"আমাদের চিন্তনীয় বিষয় সম্বন্ধে দেশের যোগ্য লোকের মত 'ভাণ্ডারে' ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশিত হইবে। দেশে মাঝে মাঝে যে সকল কথা উঠিয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে নানা বিচক্ষণ লোকের সংক্ষিপ্ত মত সংগ্রহ করিয়া 'ভাণ্ডারে' একত্র রক্ষা করা হইবে।"

'ভাণ্ডার' এই কাজ দেশের অত্যন্ত দুঃসময়ে করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই সূত্রপাত, 'বঙ্গভঙ্গ' বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, বাঙ্গালী শাসকদের প্রতি আস্থা হারাইয়াছে। নিজের উপর সে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে চায়। বিদেশী শাসনের মত বিদেশী শিক্ষায়ও সে আস্থাহীন হইয়াছে। বিদেশী পণ্য, বিদেশী সাজপোশাক, বিদেশী আচার-ব্যবহার তাহার কাছে বিষ হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত প্রধান প্রধান বঙ্গ-সন্তানেরা প্রায় সকলেই ইংরেজের পীড়ন-শোষণ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সচেতন ও অবহিত হইয়া উঠিয়াছেন। ঠিক এই শুভ মুহূর্তে 'ভাণ্ডারে'র কাণ্ডারীরূপে রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া দেশের বিদ্বজ্জন ও নেতৃমণ্ডলীকে সচকিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার পত্রিকায় বড় বড় প্রবন্ধ লিখিবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন না; সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ সম্বন্ধে "সূত্রধারের কথা"য় লিখিলেন—

"একথা উঠিতে পারে যে, দেশে বড় বড় কাগজ পত্রের ত অভাব নাই, সেসব কাগজে নানা প্রবন্ধ বাহির হয়, নানা কথার আলোচনা হইয়া থাকে।

তাহা সত্য। কিন্তু সে সকল যেন একলার কথা। কোনটা বা সখের লেখা, কোনটা বা অনুরোধে পড়িয়া লেখা। আমি অনেক সম্পাদকি করিয়াছি, আমাকে একথা কবুল করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে বড় বড় কাগজে বড় বড় প্রবন্ধ অধিকাংশই বানাইয়া লিখিতে হয়। সে সকল লেখার তাগিদ অন্তরের মধ্যে নাই। সম্পাদকের তাগিদ যে কিরূপ, তাহা আমাদের দেশের লেখকমাত্রেই জানেন।"

কাজেই প্রশ্নচ্ছলে সুচিন্তিত মতামতের মুষ্টিভিক্ষায় বাহির হইলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভাণ্ডারে'র প্রশ্নোত্তর বিভাগই হইল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এমনটি আর ইতিপূর্বে বাংলা কোনও সাময়িক পত্রে হয় নাই। 'বিচার্য প্রশ্ন' রচিত ও সর্বত্র প্রেরিত হইল। প্রথম সংখ্যার জন্য রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত প্রশ্নটি রচনা করিলেন—'আজকালকার পাবলিক উদ্যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি?' দেশের চিন্তানায়কদের নিকট প্রশ্নটি প্রেরিত হইল, জবাব আসিল নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন. এন. ঘোষ), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এই সাতজনের নিকট হইতে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এইভাবে

দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্ন মাসে মাসে প্রেরিত হইল এবং বাংলা দেশের শিরোমণিরা তাহার সমাধানে তৎপর হইলেন। অধিকাংশ প্রশ্ন করিলেন কাণ্ডারী স্বয়ং। উত্তরদাতাগণের মধ্যে প্রথম বৎসরে এই নামগুলি উল্লেখযোগ্য (উপরোক্ত সাতজনকে বাদ দিয়া)—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতচন্দ্র সেন, মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খাঁ (প্রশ্ন 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কি উপায়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইতে পারে?') নরেন্দ্রনাথ সেন, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রসিকমোহন চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত, শরৎকুমারী দেবী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রমথনাথ চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাখালদাস সেন, কামিনীকুমার চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বিপ্রদাস পাল চৌধুরী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র লাহিড়ী, বরদাচন্দ্র তালুকদার, প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, ভুবনমোহন মৈত্রেয়, রজনীকান্ত দাস, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, যাত্রামোহন সেন, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মন্মথমোহন বসু, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাংলা দেশের মনীষীদের নামের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন তৎকালীন প্রধানেরা প্রায় সকলেই এই প্রশ্নোত্তরচক্রে যোগ দিয়া দেশের কঠিন কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান-চেষ্টা করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতাদের সাক্ষাৎ পাই দ্বিতীয় বৎসরে। যদি কোনও প্রকাশক উদ্যোগী হইয়া এই প্রশ্নোত্তরমালার পুনর্মুদ্রণ করেন, তাহা হইলে একটা বড় কাজ হয়।

প্রথম বৎসরের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাধারণ পত্রিকার আকারে বাহির হয় নাই, 'শিক্ষার আন্দোলন' নামে একটি সম্পূর্ণ সঙ্কলন-গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সম্বলিত হইয়া অগ্রহায়ণ সংখ্যারূপে বাহির হইয়াছিল। এই ৬৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানি বাংলাদেশের তৎকালীন শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় তথ্যের আকর। এইটিরও পুনর্মুদ্রণ প্রয়োজন।

পরবর্তী এক বৎসরের ইতিহাসও অনুরূপ গৌরবময়। তৃতীয় বৎসরের তিন মাস অর্থাৎ শেষ তিন সংখ্যায় 'ভাণ্ডারে'র আর সে মাহাত্ম্য নাই কারণ কাণ্ডারীর হাত তখন শিথিল হইয়াছে।

'ভাণ্ডার' কেন বন্ধ হয়, তাহার স্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই। তবে শুনিয়াছি প্রকাশক কেদারনাথের অতিরিক্ত স্বদেশীয়ানা পুলিসের কৃপাদৃষ্টি

লাভ করে এবং তাঁহাকে আমেরিকায় পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯১২ সনে ইংলণ্ডে যান, তখন এমার্সন ক্লাবে 'ইউনিয়ন অব ইস্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' নামক সভা কেদারনাথেরই উদ্যোগে কবির সম্বর্ধনা করেন। বিলাতেও স্বদেশীয়গণই তাঁহাকে প্রথম সম্বর্ধিত করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" গল্পের যে ইংরেজী একাঙ্ক নাট্যরূপ 'The Maharani of Arakan' জর্জ ক্যাল্ডেরনের নামে প্রকাশিত হয় তাহার প্রথম খসড়া কেদারনাথ দাসগুপ্ত রচিত বলিয়া শুনিয়াছি।

মনে হয়, শুধু প্রকাশকের দেশত্যাগই 'ভাণ্ডার' বন্ধের কারণ নয়, রবীন্দ্রনাথের মনও যে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহার প্রমাণ ওই সালেরই শ্রাবণ মাসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে আছে। তিনি বলিতেছেন—

"দেশের যে সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি একটি মাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেল, স্থির হও, কোনো কথা বলিও না, অহরহ অত্যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিও না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে কোনও একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোন দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা কর, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে। সে জগৎ সংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে ; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধ সংস্কার হইতে রক্ষা কর।...আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহু কোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতা যুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালী যতটুকু কাজ করিয়াছিল, আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই।"

রবীন্দ্রনাথ এইখান হইতেই সক্রিয় রাজনীতি বর্জন করিলেন, সুতরাং 'ভাণ্ডারে'র হালটিও ছাড়িয়া দিলেন। 'ভাণ্ডারে'র ভরাডুবি হইল।

রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে যৌবনের মাঝামাঝি একটা বয়স পর্যন্ত নিজ জীবনের আংশিক সংবাদ সাহিত্য-রূপায়িত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত স্মৃতি-পুস্তকখানি তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রম-বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত হইয়াছে; আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য খবরও কিছু কিছু আসিয়া পড়িয়াছে। বহুকাল পূর্বে ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সখা ও সাথী' (শ্রাবণ, ১৩০২, পৃঃ ৭৬-৭৯) পত্রিকায় তাঁহার একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়, তিনি স্বয়ং পরবর্তী ভাদ্র সংখ্যায় (পৃ. ১০৩-৪) উক্ত চরিত-কথার ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণের দরবারে উহাই তাঁহার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য জীবনী। সেকালে যাঁহারা সঙ্গীত-চর্চা করিতেন, তাঁহারা ইহারও পূর্বে 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' নামক সঙ্গীত-সংগ্রহের পরিশিষ্টে তখন-পর্যন্ত-বৈচিত্র্যহীন এই জীবনের পরিচয় সংক্ষেপেই জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ যুগের কৌতূহলী পাঠকের কাছে তাহা কৌতুককর মনে হইতে পারে। এই পুস্তক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র ২৩।

> "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—এই যুবক কবি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। সঙ্গীত রচনাতে কলিকাতার ঠাকুর বংশ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। ইঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রণয় সঙ্গীত শিক্ষিত বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হয়। ইঁহার সঙ্গীতে অনেক রকম নূতন সুর ও নূতন ভাব সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ধন্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী! কত যে সুন্দর জিনিষ ইহা হইতে বাহির হইয়াছে, এবং আরো কত যে বাহির হইবে কে বলিতে পারে। বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্গীত রচনা করিয়া রবীন্দ্র বাবু দেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ উত্তম সঙ্গীত রচয়িতা বলিয়াই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ এমত নহে; সুগায়ক বলিয়াও বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।"

সম্ভবত ইহাই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আদিমতম পরিচয়। 'সখা ও সাথী'র জীবনীটি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি,

ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম জীবনী ; দুই একটি ভুল সংশোধনের দ্বারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুমোদনও করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র রচনাটিতে যে সকল তথ্য আছে, অনেক পরে তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে তাহার অধিকাংশই ব্যবহার করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্র-জীবনী রচনার সেই প্রথম চেষ্টাটি ও রবীন্দ্রনাথের সংশোধন পর পর নিয়ে মুদ্রিত করিতেছি।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে ফুলের সৌরভ আছে, কুঁড়িতেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যাহার কুঁড়িতে সৌরভ নাই, সে ফুল ফুটিলেও সৌরভ পাওয়া যায় না। মানুষেরও প্রতিভা থাকিলে, সে প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবার আগেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যাহারা বড় লোক হইয়াছেন, তাহাদের সকলের জীবনেই আমরা এটি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

আজ বাঙ্গলার একজন প্রধান প্রতিভাবান লেখকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিব। যে প্রতিভাবলে তিনি আজ এত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বাল্যকালে সেই প্রতিভা কি রকম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র মিলন প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতার এই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে আমরা উভয়ের মিলন দেখিতে পাই। ধন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বিদ্যার এ প্রকার মিলন অতি বিরল।

খুব অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন এবং তাহা পাইলে আর কিছু চাহিতেন না। বাড়ির একজন পুরাতন চাকর দরজার নিকট বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িত, রবীন্দ্রনাথ একাগ্র হইয়া তাহা শুনিতেন, এবং শুনিতে শুনিতে কখনো হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, কখনো অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়া রাগ সম্বরণ করিতে পারিতেন না, আবার কখনো দুঃখকষ্টের বিবরণ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যেই বালক রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি আবদ্ধ ছিল। বাড়ীর বাহির হইবার তাঁহার অধিকার ছিল না ; এবং সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদের সহিতও খেলিতে পাইতেন না। দক্ষিণ খোলা একটি ঘরে বসিয়া

সম্মুখের পুষ্করিণী তীরের ঘনপল্লবময় বটগাছটির দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং বাল্যকল্পনায় সেই ছায়াময় বটমূলে কত পরীর আবাসস্থান দেখিতে পাইতেন। শ্বেতবর্ণ রাজহাঁসগুলি গলা বাঁকাইয়া পুষ্করিণীর কাল জলে আনন্দে সাঁতার দিয়া বেড়াইত, কখনো বা চঞ্চুদ্বারা আপনাদের পক্ষ পরিষ্কার করিত, মহা কুতূহলে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহাই দেখিতেন।

গৃহের বাহিরে পৃথিবীর দৃশ্য কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের এক এক সময় একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইত, একটু বাহিরে যাইবার স্বাধীনতা পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কোন সমবয়স্ক বালক বালিকাকে বাহিরের উন্মুক্ত বায়ুতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিলে, তাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী মনে করিতেন। কিন্তু শাসন বড় কঠিন ছিল, তিনি সে স্বাধীনতা পাইতেন না। তাই সময় সময় গৃহের ছাদে উঠিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া, বাহিরের জগৎটা একটু দেখিয়া লইতেন। কিন্তু কি দেখিতেন? গৃহের পর গৃহ, ছাদের পর ছাদ। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে আর কি দেখিবেন? কোথাও কেহ ছাদে উঠিয়াছে, কোন ছাদে কেহ বা কাপড় শুকাইতে দিতেছে, একমনে বালক রবীন্দ্র তাহাই দেখিতেন এবং বাহিরের পৃথিবীর দৃশ্য দেখিবার সাধ তাহাতেই মিটাইতে হইত। স্কুলে যাইতে হইলেও তাঁহার এ সাধ কথঞ্চিত মিটিত, কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁহাকে স্কুলেও যাইতে দেওয়া হয় নাই, বাড়ীতেই পণ্ডিত রাখিয়া পড়ান হইত। তাঁহা অপেক্ষা বয়সে দুই তিন বৎসরের বড় এক ভ্রাতা ও ভাগিনেয় তখন স্কুলে যাইতেন। তাঁহারা বয়স্থদের ন্যায় স্বাধীনভাবে বাড়ীর বাহিরে যান, আর তিনি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, ইহা তাঁহার কাছে অতিশয় জুলুম মনে হইত। স্কুলে যাওয়া আর স্বাধীনতা পাওয়া, তাঁহার কাছে তখন একই কথা বলিয়া মনে হইত। স্কুলে যাইবার জন্য এক এক সময়ে তিনি কাঁদিতেন; তখন বাড়ীর পণ্ডিত মহাশয় [মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] বলিতেন,—'এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য কাঁদছ, এর পর স্কুলে যেতে হবে বলে কাঁদবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ মহাভারতের গল্প তিনি একাগ্রমনে শুনিতেন। চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় যখন নিজেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিলেন, তখন আর তাঁহার আনন্দ ধরে না। তখন কতক বুঝিতেন, কতক বা বুঝিতেন না; কিন্তু তবু পড়িয়া কতই সুখী হইতেন। রবীন্দ্রনাথ অতি

অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখার আরম্ভটা কিরূপে হয়, শুন। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে চারি পাঁচ বৎসরের বড়, তাঁহার একজন আত্মীয় একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—"আয় রবি আমরা কবিতা লিখি।" রবি বলিলেন,—"কেমন করিয়া কবিতা লিখিতে হয়, তাত আমরা কিছুই জানি না।" তখন তিনি বলিলেন,—"ও আর শক্ত কি, প্রতিছত্রে চৌদ্দটা করিয়া অক্ষর দিয়া মিল করিয়া লিখিলেই কবিতা হইল।" রবীন্দ্রও সেই উপদেশ অনুসারে কবিতা লিখিতে বসিলেন। তখন হাতের লেখা, অতি অল্প বয়স্ক বালকের যেমন হইয়া থাকে, তেমনি ছিল। বড় বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ পদ্ম সম্বন্ধে এক কবিতা লিখিলেন, সেই তাঁহার প্রথম লেখা।

ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহাদিগকে পানিহাটির বাগানে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইবে স্থির হইল। পানিহাটির বাড়ীটি গঙ্গার ধারে, সম্মুখে বিস্তৃত বালুকাময় চড়া। গাছপালা, স্বভাবের শোভা, পাখীর গান, নদীর কুল্ কুল্ রব, এই সমস্ত দেখিবার ও শুনিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন বড় ব্যাকুল হইত। এতদিনে তাঁহার সে সাধ মিটিল। কলিকাতা থাকিতে তাঁহার একটুও স্বাধীনতা ছিল না, অন্যান্য বালকেরা যে স্বাধীনতাটুকু পায়, তিনি তাহাতেও বঞ্চিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলে যেখানে সেখানে বেড়াইবে, অভিভাবকগণ তাহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ কতকটা স্বাধীনতা পাইলেন। সেই বাগানে যতদিন বাস করিতে পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার খুব সুখের দিন ছিল বলিয়া মনে করিতেন। গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা গঙ্গার চড়ায় নৌকা বাঁধিয়া যাত্রিরা রাঁধিতেছে, কখনও বা নদীর জলে 'টাপুর টুপুর' বৃষ্টি পড়িতেছে, বালক রবীন্দ্রনাথ আকুল প্রাণে সেই সকল দেখিতেন। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান' তখন তাঁহার মনে পড়িত এবং গঙ্গার চড়ায় যাত্রিদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইত, শিব ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া গঙ্গার চড়ায় বাস করেন।

অভিভাবকগণ যখন রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে পাঠাইবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তখন নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বালক কবিতা লিখিতে পারে। তাই একদিন রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া

সেকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাঁ বলিলেন। তখন সাতকড়ি বাবু বলিলেন, 'আচ্ছা আমি দুটি পদ দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া একটি কবিতা রচনা কর'।

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

বালক রবীন্দ্র এই দুটি চরণ লইয়া এক মস্ত কবিতা লিখিয়া দিলেন; তাহা হইতে দুটি ছত্র নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

"মীনগণ দীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলে ক্রীড়া করে।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স আট বৎসর মাত্র। উদ্ধৃত দুটি চরণ পড়িলেই, এই ক্ষুদ্র বালকের প্রতিভার আভাষ পাওয়া যায়।

হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপর হাড়ে চটা ছিলেন; কখনও ইহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাশে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে, অনেক সময়ে উঠানে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সে আবার সোজা দাঁড়ান নয়, মাথা হেঁট করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া, অনেকক্ষণ এক ভাবে থাকিতে হইত। কিন্তু এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন, ছেলেটার কিছু হইবে না; কিন্তু যখন বৎসরের শেষে পরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের নিকট রবীন্দ্র খুব বেশী নম্বর পাইয়া ক্লাসে ১ম কি ২য় হইলেন, তখন হরনাথ পণ্ডিত তাহা বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি বলিলেন, —'পরীক্ষক পক্ষপাত করিয়া বেশী নম্বর দিয়াছেন। যে সারা বৎসর কিছু পড়ে নাই, সে কেমন করিয়া এত নম্বর পাইল।' রবীন্দ্রনাথের পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইল। এবার অন্যান্য শিক্ষকদের সমক্ষে পরীক্ষা হইল। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বের অপেক্ষাও এবার বেশী নম্বর পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগের সহিত পড়া তৈয়ার করিতেন, কিন্তু হরনাথ পণ্ডিতের উপর বিরক্তি বশতঃ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। হরনাথ পণ্ডিতের মনে হইত, রবি কিছুই করে না।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ পিতৃঠাকুর মহাশয়ের সহিত বোলপুরে যান।

সেখানে তৃণ লতা, পত্র পুষ্পশোভিত ক্ষেত্রের উন্মুক্ত বায়ুতে ছুটাছুটি করিবার স্বাধীনতা পাইয়া, সে যেন এক নূতন জীবন পাইলেন।

তারপর পিতার সহিত ডালহাউসি পাহাড়ে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, পুত্রকেও সেই সময়ে উঠিয়া সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোক ও সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্ত করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিষ বড় ভালবাসিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষের কথা শিখাইতেন এবং সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমার কথা বলিতেন। ইংরাজী জ্যোতিষের পুস্তক হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা রচনা শিক্ষা হইত।

কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই নগরে তাঁহার ভ্রাতা, সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গিয়া থাকেন। সেখানে সত্যেন্দ্রবাবুর লাইব্রেরীতে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পুস্তক পড়াই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর এবং এই সময় হইতেই তিনি রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। 'ভারতী' মাসিক পত্রে এই সময় হইতেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বিলাতের লণ্ডনে ইউনিভারসিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন এবং ইউরোপের নানা দেশ বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। সেই অবধি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা-পুস্তক লিখিয়াছেন; এবং উঁহার কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলা যায়। সকল প্রকারের সঙ্গীত রচনায়ই তিনি সিদ্ধহস্ত, নিজেও একজন অতি সুগায়ক; সঙ্গীতের ভাষা, ভাব ও সুরের এমন সুন্দর সমাবেশ কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহ আছেন কি না সন্দেহ। নাটক নভেলও তাঁহার কয়েকখানি আছে, তাহা ছাড়া প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের ত সংখ্যাই নাই। তাঁহার রচিত 'রাজর্ষি' বালক বালিকাদিগের পড়িবার উপযোগী একখানি অতি সুন্দর পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবিতাই অধিক লিখিতেন এবং একজন অসাধারণ কবি বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁহার সমকক্ষ গদ্য লেখকও বড় দেখা যায় না। বঙ্কিমবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অতিশয় প্রশংসা করিতেন। একবার একটি সভায় দেশের প্রধান প্রধান লেখকগণ একত্রিত

হইয়াছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর গলায় এক ছড়া মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিমবাবু সেই মালা ছড়াটি, রবীন্দ্রনাথের গলায় সাদরে পরাইয়া দিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কাছে এ প্রকার সমাদর লাভ করা সাধারণ গৌরবের কথা নয়। আজকাল রবীন্দ্রনাথকে দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

পরবর্তী ভাদ্র সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে সম্পাদককে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পাদকের মন্তব্য সহ প্রকাশিত হইল। যথা—

"রবি বাবুর পত্র

শ্রাবণ মাসের 'সখা ও সাথী'তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাল্য-জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দুই একটি ভ্রম দেখাইয়া রবীন্দ্র বাবু আমাদের যে চিঠি লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতিভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগেভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সংকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ, এখনো আমার জীবন আমারই হস্তে আছে; আশা করি, আরও কিছুকাল থাকিবে, যখনই ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাঁহার ধর্ম্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্য-বিবরণ লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া গিয়াছিলেন, তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই—এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিকপত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।

কিন্তু তাহা লইয়া অধিক পরিতাপ করিতে বসিলে অবিনয় প্রকাশ করা হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের দুই একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, সেইখানে বঙ্কিমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় কন্যা-কর্ত্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইতে আসিলে তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না—এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য লেখকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই।

২। ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন; আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।

৩। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন উপাধি দেওয়া হইয়াছে; নিশ্চয়ই সেটা বিস্মৃতিবশতঃই ঘটিয়াছে।

৪। অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া প্রভূত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম সে কথা যথার্থ।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম জীবনীতে আমাদের কাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম দুই পংক্তির পাঠভেদ 'জীবন-স্মৃতি'তে দ্রষ্টব্য। আর একটি সংবাদ রবীন্দ্রনাথ হরনাথ পণ্ডিতের সন্দেহক্রমে পুনঃ-পরীক্ষা সম্পর্কে আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা এই:

"অধ্যক্ষ খোঁড়া গোবিন্দবাবু স্বয়ং এই পরীক্ষা নিয়েছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ 'সখা ও সাথী'তে জীবিত ব্যক্তির জীবনী প্রকাশের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করা সত্ত্বেও দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়, কারণ আমরা দেখি বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে ১৩১১, পৃ. ৯৬৪-৯৮৪ তিনি স্বয়ং "কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে ভাবে

প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে" লিখিয়াছিলেন। এই কাব্য-জীবনটি নানা দিক দিয়া অতিশয় মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পরে ১৩৫০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে প্রকাশিত 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে এই রচনাটি স্থান পাইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ২৮শে ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্য-জীবন সম্পর্কে অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন। 'আত্মপরিচয়ে'র পরিশিষ্ট-রূপে রবীন্দ্রনাথের পত্রটির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহারই এক বৎসর পরে ১৩১৮ ভাদ্র হইতে ১৩১৯ শ্রাবণ পর্যন্ত পূরা এক বৎসর কাল ১২ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' বাহির হয়। 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত আসিয়া তিনি থামিয়া যান। ইহার পর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় জয়ন্তী-'প্রতিভাষণ' ১১ই পৌষ ১৩৩৮ ও 'ছেলেবেলা'য় ভাদ্র, ১৩৪৭ বাল্যজীবনের কয়েকটি বিস্তৃততর চিত্রাঙ্কণ ছাড়া নিজের বৈচিত্র্যময় জীবনের কাহিনী তিনি আর শোনান নাই। দুই একটি প্রবন্ধে (যথা, "আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা"—'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৪০) বা বক্তৃতায় যেটুকু তথ্য উঁকি মারিতেছে, কৌতূহল নিবারণ তো দূরের কথা, তাহা প্রয়োজনের পক্ষেও যৎসামান্য।

সুখের বিষয়, এদেশের ও বিদেশের অসংখ্য সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় ছাড়াও তাঁহার বিচিত্র জীবনের একটা ধারাবাহিক কাহিনী বাংলা-ইংরেজী অসংখ্য চিঠিপত্রে ছড়াইয়া আছে। মানুষের ইতিহাসের গোড়া হইতে আজ পর্যন্ত চিঠি লিখিয়ে হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ; জীবনে স্বহস্তে কত চিঠি লিখিয়াছেন, এখনও তাহার সীমা-সংখ্যা করা সম্ভব নয়। ইহার অনেকগুলিই তিনি কাটছাঁট করিয়া 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ১৮৮১, 'ছিন্নপত্র' ১৯১২, 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ১৯৩০, 'পথে ও পথের প্রান্তে' ১৩৩৮, ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ' শেষ সংস্করণ প্রভৃতিতে মুদ্রিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত 'চিঠিপত্র' ছয় খণ্ডে তাঁহার বহু বাংলা চিঠি প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজীতেও চিঠির সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বহু সাময়িক-পত্রে তাঁহার এমন অনেক চিঠি ছাপা হইয়াছে, যেগুলি পুস্তকাকারে এখনও বাহির হয় নাই। 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি'-জাতীয় পুস্তকেও তাঁহার অনেক চিঠি আছে। তাহা ছাড়া, এখনও মুদ্রিত হয় নাই এমন অসংখ্য চিঠিপত্র বহু ব্যক্তির সংগ্রহে রহিয়াছে। সেগুলি একত্র হইলে রবীন্দ্রনাথের একটা

ধারাবাহিক জীবনী খাড়া করা কঠিন হইবে না। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে। যিনি অপেক্ষা করিবেন না, তাঁহার রবীন্দ্রজীবনী অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। সুখের বিষয় শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসম্পূর্ণতার ভয় উপেক্ষা করিয়াই সাময়িক-পত্রের প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, বিভিন্ন স্মৃতিকথা ও ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সাহায্যে তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী' চার খণ্ড খাড়া করিয়াছেন। এইটিকে আশ্রয় করিয়া পরবর্তী জীবনীকারদের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। ১৯৪১ সন ১৭ই মে বিশেষ জন্মদিন সংখ্যা ও ১৯৪১ সন ১৩ সেপ্টেম্বর বিশেষ রবীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যা 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে' এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টালি'র রবীন্দ্র-জন্মদিন সংখ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীর যে সংক্ষেপ বিবৃতি বাহির হইয়াছে, আমরা সেগুলিকেও অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচনা করি। প্রভাতবাবুর পুস্তক প্রকাশের পরে আবিষ্কৃত অনেক তথ্য এখনও নানাস্থানে প্রকাশিত হইতেছে। 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'-এ শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কর্তৃক সঙ্কলিত জীবন-কাহিনীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা ১৩০৮ বৈশাখ ও ১৯০৭ জানুয়ারি হইতে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত সকল সংখ্যায়, 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টালি'র সকল সংখ্যায়, অধুনালুপ্ত 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সকল সংখ্যায়, বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিনগুলিতে ও বিশেষ করিয়া বিগত ১৫ বৎসরের বাংলা 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় এবং মাসিক 'শনিবারের চিঠি'তে বিগত বত্রিশ বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্র-জীবনীর যে সকল উপকরণ আত্মগোপন করিয়া আছে, সেগুলি জীবনী-লেখকদের পক্ষে অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যাঁহারা তাঁহার জীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারা পূর্বগামীদের সম্পত্তি আত্মসাৎ বা চর্বিতচর্বণ না করিয়া যদি প্রত্যেকেই এই সকল চিঠিপত্র সংগ্রহ করিয়া সেগুলি হইতে নূতন কোনও তথ্য দিবার চেষ্টা করেন, তবেই সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় একটি নির্ভরযোগ্য জীবনী রচিত হইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে নানা জনের কাছে মুখে মুখে নিজের জীবনের কাহিনী বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত রঙে রঙিন করিবার চেষ্টা না করিয়া সেগুলিও লিখিত হওয়া উচিত; প্রমাণ করিতে পারিলে ভালই, না পারিলেও ক্ষতি নাই।

'জীবন-স্মৃতি'র ৭৬ পৃষ্ঠায় আছে—

"...সেণ্টজেবিয়াসে আমাদের ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোনো ফল হইল না।"

উক্ত কলেজের পুরাতন খাতাপত্র হইতে সন্ধান লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'রবীন্দ্র-জীবনী', 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টালি' ও 'মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র বিশেষ সংখ্যাগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন, "১৮৭৫ সালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।" শেষোক্ত পত্রিকা দুইটিতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভর্তি হইবার কথা আছে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের খাতাপত্র কলেজ হইতে খোয়া গিয়াছে, তবে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় নূতন ভর্তি হওয়ার সংবাদ না থাকাতে মনে হয়, তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ এই দুই বৎসরের রেকর্ডে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভ্রমক্রমে "নবীন্দ্রনাথ" লেখা আছে) এই উভয় ভ্রাতার নাম পাইতেছি। দুই জন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, তখনকার নাম ছিল ফিফ্‌থ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরি এণ্ট্রান্স ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত "ইর্‌রেগুলার" ছিলেন, প্রায়শঃই কামাই করিতেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের খাতায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রোমোশন পান নাই, সোমেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। সম্ভবত ইহার পরই তিনি ক্ষান্ত দিয়াছেন। কিছুকাল-পূর্বে-পরলোকগত একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন, দুই ভাইয়ে খুব সাজগোজ করিয়া গাড়িতে চাপিয়া স্কুলে আসিতেন।

আমাদের এই প্রসঙ্গ বিশেষভাবে লিখিবার কারণ, আমরা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের এমন একটি পরিচয় পাইয়াছি, যাহার খবর তাঁহার কোনও জীবনী অথবা ক্রনিক্‌লে নাই। ইহা তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ নূতন দিক। দেশকর্মী ও বাগ্মী শ্রীযুক্ত অতুল সেন আমাদিগকে এই উপকরণ যোগাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযজ্ঞে তিনি স্বয়ং ছিলেন হোতা; এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত চিঠিগুলিও তাঁহারই নিকট লিখিত। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্যপ্রচারে তিনি যেরূপ অকুণ্ঠচিত্তে তৎপরতার সহিত আগাইয়া আসিয়াছেন, ওয়াকিবহাল সকল ব্যক্তিই যদি সেইরূপ তৎপরতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জীবনী-কারদের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে।

কোনও বিষয়েই অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকে শান্ত সংযত ভদ্র রবীন্দ্রনাথ অপছন্দ করিতেন। আতিশয্য বস্তুটিকে তিনি আজীবন পরিহার করিয়া

চলিয়াছিলেন। স্বদেশী যুগের উগ্র মাদকতায় বস্তু অপেক্ষা ফেনা, কাজ অপেক্ষা বচনের আধিক্য যখন প্রকাশ পাইল, তখন রবীন্দ্রনাথ আপন স্বভাববশেই জনগণের পথ পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র পথ ধরিলেন; সে পথ কর্মবিমুখতা বা নিষ্ক্রিয়তার পথ নয়। শান্তিনিকেতন আশ্রমকেই কেন্দ্র করিয়া তিনি স্বদেশ সম্বন্ধে আপন কর্তব্য পালন করিবার চেষ্টা পাইলেন। ইহার পূর্বেই দেশের হিতকর নানা বিফল প্রযত্নে তিনি বহু সময় ও অর্থ অপব্যয় করিয়া বসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে ধীরে সুস্থে একেবারে গোড়া বাঁধিয়া কাজ শুরু করিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনের সভাপতিরূপে যুবকদিগকে বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান মিলন ও বাংলা দেশের পল্লীর উন্নতির জন্য হাতেকলমে কাজ করার উপদেশ দিলেন, এবং সর্বশেষে স্বয়ং জমিদার হইয়া বাংলা দেশের জমিদারদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ৎদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভাল আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সেই অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কি করিয়া?"

ইহার পর কেমন একটা ওলট-পালট হইয়া গেল; কবি কাব্যসৃষ্টির আনন্দে আত্মহারা হইলেন; সাহিত্য-সৃষ্টির এমন প্রচণ্ড প্রেরণা ও বেগ তিনি নিজের জীবনে আর কখনও এরূপ ভাবে অনুভব করেন নাই। 'গীতাঞ্জলি'র যুগ শুরু হইল এবং দেশপ্রেমিক কবি ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে, বিশ্বের দিকে মুখ ফিরাইলেন। এই যুগের সাধনার পুরস্কার লাভ করিয়া যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন দেশও শান্ত হইয়াছে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন হইতে বাংলা দেশের পল্লীর উন্নতির কথা একদিনের জন্যও যে মুছে নাই, তাহার প্রমাণ তিনি লণ্ডনে বসিয়াই সুরুল-শ্রীনিকেতনের পত্তন করিয়াছিলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ (১৯১৪ এপ্রিল)

শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হইল এবং পাবনা সম্মিলনীতে তিনি বাংলা দেশের জমিদার-সম্প্রদায়কে যে কাজের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, নিজেই তাহার পথপ্রদর্শক হইলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, তিনি যাহা করিতে চাহিতেছিলেন, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে তাহা বাধাগ্রস্ত হইতে লাগিল ; সম্ভবত এই দুই স্থান তাঁহার জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলিয়া তাঁহার কল্পনা কর্মে স্ফূর্তি পায় নাই। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমরা তাঁহাকে কলিকাতার বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর সহিত যুক্ত দেখিতে পাই। ইঁহাদের উদ্যোগে ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি ১৯১৫) ও ১লা ফাল্গুন (১৩ ফেব্রুয়ারি) ও ১৪ চৈত্র (২৮ মার্চ) পর পর তিনটি সভা হয়। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি "কর্মযজ্ঞ" নামে ফাল্গুনের (১৩২১) 'সবুজপত্রে' এবং তৃতীয় বক্তৃতাটি "পল্লীর উন্নতি" নামে বৈশাখের (১৩২২) 'প্রবাসী'তে বাহির হয়। বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর কর্মপদ্ধতি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ নির্ধারণ করিয়া দেন—

১। নিরক্ষরদিগকে অন্ততঃ যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখানো। ২। ছোট ছোট 'ক্লাস' ও পুস্তিকা প্রচার দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। ৩। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা। ৪। শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন। ৫। গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। ৬। গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন। ৭। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময়ে দুঃস্থদিগকে বিবিধপ্রকারে সাহায্য।

"কর্মযজ্ঞে" তিনি বলিলেন—

আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য ভোগ করচে, কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়েচেন জীর্ণ কন্থার উপরে—আমাদের তিনি ভার দিয়েচেন দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার। তিনি বলেচেন—অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালুম, অজ্ঞানের মধ্যে পাঠালুম, অস্বাস্থ্যের মধ্যে পাঠালুম, তোমরা আমার বীরপুত্র সব।

শ্রীযুক্ত অতুল সেন ঠিক এই সময়ে একদল এই-জাতীয় "বীরপুত্রে"র নেতা-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা একদিন হৃদয়াবেগবশতই অগ্নিবীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন। অতুলবাবু তখন বাগনান উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। দীর্ঘকাল স্বদেশীয়ানার চর্চা করিয়া শান্ত হইয়া তিনিও একটা কিছু

করিবার জন্য ছটফট করিতেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ "পল্লীর উন্নতি"তে যখন বলিতেছিলেন—

"এই হচ্চে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করচে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্চে··—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্চে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয়নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফল্‌বে সেদিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়চে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচীর হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে বলচে, তোমাদের ঐ যা-কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয় ও ত আমারই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও।—সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত কর। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে। এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌঁচেছে, এবারে সুবৃষ্টির দিন এল বলে,·কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।"

তখন কর্মী অতুলচন্দ্রও 'চাষের ব্যবস্থা'র জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলেন।

এই কর্মপদ্ধতি এবং মনোবৃত্তি লইয়া রবীন্দ্রনাথ তখন 'সবুজ পত্রে'র নিরেট সাহিত্যিক আবেষ্টনীর মধ্যেও সুখ পাইতেছিলেন না; 'বলাকা'র কবিতা এবং 'ঘরে বাইরে'র কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন অতৃপ্তি থাকিয়া যাইতেছিল। সুবৃষ্টির দিন আসা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের মাটিতে চাষের ব্যবস্থা না হওয়াতে তিনি মনে মনে বেদনা বোধ করিতেছিলেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'তে প্রভাতবাবু লিখিয়াছেন—

"শান্তিনিকেতনের উপর মনের বিরূপতা খুবই তীব্র।···তিনি আশ্রয় লইলেন শিলাইদহে, সঙ্গে পিয়ার্সন।···প্রজাদের মধ্যে আসিলেন বহুবৎসর পরে। দিন বারো শিলাইদহে কাটাইলেন (১৬ই জুলাই—২৮ জুলাই [১৯১৫])।"

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় ইতিমধ্যেই ভাবের সঙ্গে কর্মের যোগসাধন ঘটিয়া গিয়াছে; কবি ও কর্মী মিলিত হইয়াছেন। শ্রীযুত অতুল সেন তাঁহার দলবল

সহ রবীন্দ্রনাথের জমিদারী কালিগ্রাম পরগণায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীর উন্নতিসাধন করিতে আসিয়াছেন। "স্বদেশী সমাজে"র আদর্শ, হিতসাধনমণ্ডলীর আদর্শ এতদিনে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁহার জমিদারিতেই রূপগ্রহণ করিতে চলিয়াছে। কবির মনে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। এই উৎসাহের বশে রবীন্দ্রনাথ একবার কাশ্মীর পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে, শান্তিনিকেতনে না গিয়া একেবারে শিলাইদহে উপস্থিত হইলেন। পল্লী-উন্নয়নের কাজ তখন আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ শুধু বাকসর্বস্ব ভাবুক, পৃথিবীর তথাকথিত কবিদের মত কমল-বিলাসী, তাঁহারা শুনিলে আশ্বস্ত হইবেন যে, তিনি কেবল "স্বদেশী সমাজ" লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, "স্বদেশী সমাজে"র রূপ দিবারও প্রয়াস করিয়াছিলেন। এই কার্যে সেদিন যিনি তাঁহার প্রধান সহযোগী ছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত খসড়া হইতেই এই অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা ও পরিধি সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিব। এই খসড়া ও তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি হইতেই আমরা এই বিস্তৃত ব্যাপারের একটা পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেছি। হিতসাধনমণ্ডলীর কর্মপদ্ধতি সাত দফা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে।

কালিগ্রাম পরগণা ঠাকুরবাবুদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত—রাজশাহী ও বগুড়া জিলার আত্রাই, রঘুরামপুর, রাণীনগর, সান্তাহার, তিলকপুর, আদমদীঘি, নসরৎপুর ও তালোরা—এই কয়টি রেল-স্টেশনকে ঘিরিয়া এই পরগণা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেক শত মাইল ব্যাপিয়া। শ্রীঅতুল সেন হইলেন প্রধান কর্মী, শ্রীউপেন্দ্র ভদ্র, বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি ছিলেন তাঁহার সহকারী। সঙ্গে অতুলবাবুর কর্মীসঙ্ঘ। কবিনির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত পাঁচটি: (১) যথাযোগ্য চিকিৎসাবিধান, (২) প্রাথমিক শিক্ষাবিধান, (৩) পাবলিক ওয়ার্কস্ অর্থাৎ কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল সংস্কার প্রভৃতি, (৪) ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষা, ও (৫) সালিশীবিচারে কলহের নিষ্পত্তি।

প্রথমে কাজ আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে, পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ চলিতে থাকে, হাসপাতালে যথারীতি ডাক্তার ও দুই একটি "বেডে"রও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল সৎকার্যের ব্যয়ভার অংশত জমিদার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ও

অংশত প্রজারা বহন করিতেন ; খাজনার টাকা-পিছু এক আনা তিনি দিতেন, প্রজারা দিত এক আনা। আর এক উপায়েও অর্থসংগ্রহ হইত। আমাদের দেশের রীতি এই যে (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে) কোনও ব্যক্তি সামাজিক কোনও অপরাধ করিলে তাহাকে সামাজিকভাবে বেশ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হয়। সেই অর্থে একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় সাধারণ ফণ্ডে সামান্য কিছু চাঁদা দিয়াই এই এক বিরাট ব্যয়ের হাত হইতে অপরাধীরা নিষ্কৃতি পাইত। সাধারণ ফণ্ডের টাকা এই সকল সংকার্যে ব্যয়িত হইত।

দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির এবং দিনের (Day and Night) উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়, শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া, লেখা ও পাটিগণিত (Reading, Writing, Arithmetic) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। এই শিক্ষা কিছু অগ্রসর হইলেই বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া চলিত। প্রধান লক্ষ্য থাকিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিকভাবে পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলও তাহাদিগকে শিখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (first aid), কৃষিকর্মের সুবন্দোবস্ত, অগ্নিনির্বাপণ, বন্যার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসর সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোর ব্যবস্থা ছিল।

তৃতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাবলিক ওয়ার্ক্‌স সম্বন্ধে দরিদ্র পল্লীবাসীদের সজাগ করিয়া কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই কার্যে ব্যয় অত্যন্ত অধিক। পুকুর প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত, জঙ্গল সাফ— প্রত্যেকটিই ব্যয়সাধ্য কাজ। চাঁদা তুলিয়া যে এই কার্য করা যাইবে, চাষীদের অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন নহে। সুতরাং অতুলবাবু একটি সুচিন্তিত স্কীমের আশ্রয় লইলেন। স্কীমটি কবির সানন্দ সমর্থন লাভ করিল। প্রজাদের নিকট হইতে কায়িক পরিশ্রমরূপ চাঁদা লওয়া হইতে লাগিল, অর্থাৎ এই সকল কাজে তাহারা "জন" খাটিতে লাগিল। যাহাদের সেইরূপ সামর্থ ছিল না অথচ সঙ্গতি ছিল, তাহারা প্রত্যেকে এক একজন "জনে"র মজুরি দিতে লাগিল। এইরূপে মাত্র সাত আট মাসের মধ্যেই কালিগ্রাম পরগণায় বহু সহস্র টাকার

কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা দেশের কোথায়ও ইতিপূর্বে প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় আর এইরূপ হয় নাই।

চতুর্থ উদ্দেশ্য—ঋণদায় হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার স্কীমটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাংলা দেশে একটা জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ অতিশয় অত্যাচারী জবরদস্ত জমিদার ছিলেন, ঋণের দায়ে প্রজার ফসল পর্যন্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন। ইহা অপেক্ষা নির্লজ্জ মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। এই মিথ্যা অপবাদ রটিবার একটা হেতু ছিল। তাহাই বলিতেছি। প্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর পর্যন্ত তাহাদের চলে না; কারণ মাঝখানে কাবুলী অথবা কাবুলীপ্রবৃত্তিসম্পন্ন মহাজন বসিয়া থাকে। শুধু সুদের দায়ে ফসল যায়, ঋণ যেমনকার তেমনই রহিয়া যায়। চাষী প্রজা বৎসরের কয়েক মাসই প্রায় অনশনে কাটায়। ইহার প্রতিকারার্থ রবীন্দ্রনাথ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। স্টেট হইতে প্রজাদিগকে ঠিক প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রয়োজনমাফিক এইজন্য যে, অনেক সময় তাহারা বুঝিতে না পারিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ লইয়া বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে, যেমন, পূর্বে উল্লিখিত সামাজিক দণ্ডের ব্যাপারে প্রজারা অনেক সময় ধোপা নাপিত বন্ধ হইবার ভয়ে বেহিসাবীরূপে ভোজনদক্ষিণা দিতে স্বীকৃত হইয়া বিপন্ন হইত। শ্রীঅতুল সেনের কর্মীসঙ্ঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নির্ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং ভোজনদক্ষিণার পরিবর্তে সাধারণ ফণ্ডে কিছু চাঁদা লইয়াই তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে লাগিলেন। বেতনভোগী নায়েবদের হাতে ছাড়িয়া দিলে অনাচার হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঋণ লইয়া চাষী চাষ করিল। ফসল কিন্তু তাহার ঘরে উঠিল না, ঋণশোধ বাবদ স্টেট তাহা গ্রহণ করিল; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা সুদ সর্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত অর্থাৎ প্রজাকে শতকরা ছয় টাকা সুদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া ঋণ শোধ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মাফ করা হইত। ইহার পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজনমত ঋণ লইবার অধিকারী থাকিত। ইহাতে চক্রবৃদ্ধি হারে সর্বনাশা সুদের কবল হইতে তাহারা সর্বদাই রক্ষা পাইত। এই স্কীম এতদূর পর্যন্ত সফল হইয়াছিল যে, কালিগ্রাম পরগণায় অন্যান্য মহাজনদের, বিশেষ করিয়া

কাবুলীপন্থী মহাজনদের ব্যবসায় অচল হইয়াছিল। স্টেটের এমনই সুনাম হইয়াছিল যে, কোনও প্রজা অন্য কোনও মহাজনের নিকট টাকা ধার করিতে গেলেই মহাজন বলিত, বাপ রে, স্টেট হইতে যে ঋণ পায় নাই, তাহাকে ঋণ দিব কোন্ সাহসে? অর্থাৎ স্টেট যাহাকে ঋণ না দেয়, তাহার নিশ্চয়ই কোনও গলদ আছে। এই ব্যবস্থার ফলে কালিগ্রাম পরগণার প্রজারা বহুদিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে অপবাদ রটিয়াছিল, তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফসল উঠানো লইয়া।

পঞ্চম উদ্দেশ্য—সালিশী দ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। এইরূপ সালিশীর ব্যবস্থা ঠাকুর স্টেটে অল্পবিস্তর পূর্ব হইতেই ছিল। এবারে এই কার্যের ভার অতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হইত। তিনি বিচারবুদ্ধিমত সুরাহা করিয়া দিতেন। এই কার্যে প্রজারা এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিল, সম্ভবত মামলার অপব্যয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল বলিয়াই, যে, তাহারা অতুলবাবুকে হিন্দু মুসলমান ভেদে যথাক্রমে অতুলবাবু মশাই—রাজাবাবুর প্রতিনিধি এবং মৌলানা রতুলবাবু বলিত। রবীন্দ্রনাথই রাজাবাবু ছিলেন। এই স্কীম যতদিন চলিয়াছিল, ততদিন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর এই পরগণা হইতে একটি মামলাও সদরে যাইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নই দেখেন নাই, সুবৃহৎ পরিসরে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন—এই সংবাদটি নানা কারণে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার এই দিকটি অজ্ঞাত থাকায় আমাদেরই ক্ষতি হইয়াছে; বাংলাদেশ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ পায় নাই। অজ্ঞাত থাকার আর একটি কারণ, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে নেতা অতুল সেন সহ তাঁহারা সকলেই রাজরোষে পতিত হইয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য এখানে ওখানে অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযোগের দিকটা দেশের লোকের কাছে প্রচারের সুযোগ পান নাই। তাঁহাদের শৃঙ্খল যখন উন্মোচিত হইয়াছিল অর্থাৎ তাঁহারা যখন দেশের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে

পারিয়াছিলেন, দেশের আবহাওয়া তখন আমূল পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে ; নন্‌-কো-অপারেশনের বন্যায় দেশ প্লাবিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে পাড়ি দিয়াছে।

এই যুগের কিছু দলিল অতুল সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলির মধ্যে আছে। এবারে সেগুলি দাখিল করিতেছি। এই পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কর্মস্পৃহা, কর্মপদ্ধতি ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই উপযুক্ত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা নিজেদের দোষে সেই কল্যাণকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছি। পত্রগুলি এই :

১। কালিগ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল—এমন কি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে আমি ঐ কথা আলোচনা করে ঘুমতে পারিনি। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা সুস্থ হল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে এখানে এসেচি তাই কয়েকদিন নদীর উপরে থেকে একটু সুস্থ হয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। এখানেও প্রজাদের নানা দরবার উপস্থিত হয়েছে তাই সমস্ত না সেরে নড়তে পারচিনে। কাজকর্ম্মের প্রণালী সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে মোকাবিলায় বসে ঠিক করা যাবে। —[পদ্মাচর] অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

২। অতুল, হঠাৎ আমার অন্যত্র ডাক পড়েছে। কলকাতায় এক জায়গায় আমি বক্তৃতা করতে প্রতিশ্রুত ছিলুম সে কথা কিছুই মনে ছিল না, কিন্তু যাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুত এ সম্বন্ধে তাদের স্মরণশক্তি আমার চেয়ে প্রবল তাই যেতে হচ্চে। তার পরে বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার একটি প্রস্তাব আছে, সেটি কোনো একটি সভায় পাঠ করতে হবে।* কোনো ফল হবে কিনা জানিনে কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজ করবার উপদেশ আছে—অন্তত একটা ফল পাবার আশা আছে। সেটা হচ্চে গালি।

তার পর আমার বিদ্যালয়। ৭ই পৌষ আসচে—সে কাজটি এড়াবার জো নেই। অতএব ৭ই পৌষের পর তোমাদের কাছে শীতভোর থাকবার কথা রইল। তাড়াতাড়ি দুচারদিন গিয়ে কোনো কাজ হবে না।

এ কয়দিন যাবার উদ্যোগ করছিলুম বলে চিঠির জবাব দিতে পারিনি।

—[পদ্মাচর] ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২।

* "শিক্ষার বাহন" বক্তৃতা, ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২ (১০ ডিসেম্বর, ১৯১৫) -রামমোহন লাইব্রেরি।

৩। তোমার অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলাম।

তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থাৎ যাহাতে কাজের অঙ্ক কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তোমাদের হিসাব যখন audit হইবে তখন সকলপ্রকার ব্যয়ের voucher যেন থাকে এবং মোটা মোটা খরচ সম্বন্ধে সুরেনের [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর] হুকুম আদায় করিয়া রাখিয়ো—হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

—[কলিকাতা] ইতি ৬ই মাঘ ১৩২২।

৪। আজ মাঘোৎসবের ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমার কর্ম্মের মধ্যে তাঁহার শান্তি, কল্যাণ, ও প্রেমকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলুন। আমি কয়েকটি ওলাওঠার ওষুধের বাক্স শীঘ্র পাঠাইতেছি এবং যদি হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার পাঠাইতে পারি চেষ্টা দেখিব।

—[কলিকাতা] ইতি ১১ই মাঘ ১৩২২।

৫। আমি পর্শু রেলযোগে যাবার উদ্যোগ করছিলেম এমন সময় আজ খবর এল পিয়ার্সন আমার এখানে আজ রাত্রের গাড়িতেই আসচেন। তাই ঠিক করেচি কাল তাঁকে নিয়ে বোটে করে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে রেলে করে যাব। তাঁর শরীর খারাপ বলেই তিনি একটু বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী।

তা হলে বোধ হয় মঙ্গল কিম্বা বুধবারে গিয়ে পৌঁছব, যদি পিয়ার্সন যেতে পারেন ত ভালই—তিনি খুসি হয়ে আসবেন। ওখানে গিয়ে সব কথা পাকা করে আসা যাবে।

প্রজাদের ডেকে তোমার যা বোঝাবার বুঝিয়ে রেখো—আমি গিয়ে উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত করে আসব। [শিলাইদা] ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩২২।

৬। তুমি এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টার রূপে মাসিক আশি টাকা বেতন পাইবে স্থির হইয়াছিল এইজন্য বেতন সম্বন্ধে প্রজাদিগকে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। এণ্ট্রেন্স স্কুল উঠিয়া যাওয়াতেই এ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইল। সাধারণ ফণ্ড হইতে পঞ্চাশ ও ষ্টেট হইতে ত্রিশ টাকা বেতন স্থির করিলাম। কারণ, সাধারণ ফণ্ডে মাসিক আশি টাকার ভার কিছুতেই সইবে না। একথা লইয়া প্রজাদের মধ্যে কিছু আলোচনা চলিতে পারে

এখান থেকে আর দুতিন দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে তোমাদের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী আনুপূর্ব্বিক ঠিক করে রেখো। বিশুকে বিস্তারিত সমস্ত লিখেছি, দেখা হলে আলোচনা করা যাবে।

১০। তোমার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হয়েছি। আমি পতিসরে এসে পৌঁছবার পূর্ব্বে তুমি ওখানকার ক্ষেত্রটি বেশ দখল করে বসবে এইটে হলেই সুন্দর হয়। কেননা আমি মাঝখানে পড়ে যা কিছু করব সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে না। আমার মন জোগাবার জন্যে কিম্বা আমার হুকুমে যা হবে সেটা হয়ত একেবারে অন্তরের জিনিস হবে না—এবং তার থেকে ঈর্ষা বিরোধের সৃষ্টি হতেও পারে। আমরা যে পক্ষে থাকি সে পক্ষের প্রতি অন্য সকলে অনেক সময় বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে—তার প্রধান কারণ ক্ষমতানাশের আশঙ্কা। এটা আমি বারবার দেখেছি সেইজন্য কারো আনুকূল্য করতে দ্বিধা হয় পাছে সেটা প্রতিকূলতা হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা একবার ওখানকার হৃদয় অধিকার করে দাঁড়ালেই আর কোনো ভয় থাকবে না। সে তোমরা নিশ্চয় পারবে আমি জানি। সেই পারাটা তোমাদের নিজের কৃতিত্বে হলেই তোমাদের যথার্থ জয় হবে। যে কাজে তোমরা প্রবৃত্ত হচ্চ সেটা তোমাদেরি যথার্থ সৃষ্টিকার্য্য হয় এই আমার ইচ্ছা; তোমরা তার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরিমাণে অনুভব করবে—যখন মূর্ত্তিটি গড়া হয়ে যাবে তখন তোমরা তার ভিতর নিজের জীবনের সাধনার প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পাবে। আমি কেবল তোমাদের ক্ষেত্র দিয়েছি এই পর্য্যন্ত—এবং যদি কখনো তোমরা আমাকে কোনো বিষয়ে তোমাদের সহযোগী করতে চাও তাহলে আমাকে পাবে।

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় হে—
ওহে বীর, হে নির্ভয়।

। শিলাইদা। ইতি সোমবার।

১১। এই ত চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্ত্তিতে আছে—এখন তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভাবিতে হইবে—এখন পালে হাওয়া লাগিয়াছে—হুহু করিয়া চলিয়া যাও। কোনো বাধাই টিঁকিবে না। কিন্তু মনটাকে ঠাণ্ডা রাখিয়ো—উন্মাদনাও ভাল নয় অবসাদও ভাল নয়—যাহা ঘটিতেছে তুমি তাহার উপলক্ষ্য মাত্র

এ কথা মনে রাখিয়ো। আবার যদি গড়া জিনিস কখনো ভাঙে তখনো অবিচলিত থাকিতে হইবে। মনটাকে কাজের ক্ষেত্রের বহু ঊর্ধ্বে রাখিলে তবেই কাজ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইতে পারিবে। লেশমাত্র অহমিকা যেন তোমাকে না আক্রমণ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া কাজ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দের সঙ্গে তাহার সাহায্য করে। যেই তুমি বলিবে আমি করিতেছি অমনি একলা পড়িবে। [শান্তিনিকেতন]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন প্রসন্ন হইয়াছেন কালিগ্রামের ভাগ্যাকাশে তখন এক খণ্ড কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে সেই মেঘ বৃহদায়তন হইয়া আকাশ গ্রাস করিল, প্রায় সকল কর্মী সহ নেতা শ্রীঅতুল সেন অন্তরায়িত হইলেন। ইহাতে এই কাজের ভরা পালে যে ফুটা হইল, নৌকাডুবি তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। গড়া জিনিস যখন ভাঙিল, স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তখনও অটল রহিলেন। পরবর্তী পত্রখানি তিনি শ্রীযুক্ত অতুল সেনের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবীকে লিখিয়াছেন।

"তোমার স্বামীর অন্তরায়ণ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। কি কারণে তাহার এই বিপত্তি ঘটিল তাহা কিছুই জানি না। এ সম্বন্ধে রাজপুরুষদের নিকট আমি পত্র লিখিয়াছি। তাহার কোনো ফল হইবে কি না তাহা বলা যায় না। তোমরা যে দুঃখ ভোগ করিতেছ ভগবান তোমাদের সেই দুঃখকে কল্যাণে পরিণত করুন এই কামনা করা ছাড়া আর আমাদের কিছু করিবার নাই। [শান্তিনিকেতন] ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৪।"

পল্লী-সংস্কারক কর্মী রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় শ্রীঅতুল সেনের নিকট লিখিত এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ৺মনোরঞ্জন চৌধুরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া সে পরিচয় স্পষ্টতর করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মনোরঞ্জন-বাবু বাঁকুড়া কলেজের ছাত্র। ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থকর্তা এডওয়ার্ড টমসন তখন উক্ত কলেজের অধ্যাপক। তিনি ছাত্র মনোরঞ্জনের মধ্যস্থতায় কবির নিকট হইতে বাঁকুড়ায় কোনও একটা উপলক্ষে উপস্থিত হইবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। যাইবার কথা ছিল ১১ই মাঘের (১৩২২) পরেই। কিন্তু ১০ই মাঘ তারিখে রবীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জনকে লিখিলেন : "বাঁকুড়ায় যাইব স্থির ছিল কিন্তু পতিসরে আমি যে পল্লীর কাজ

ফাঁদিয়াছি সেখানে কাজের গোলমাল বাধিয়াছে। শীঘ্র না গেলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে।···দেরি যথেষ্ট হইয়াছে, আর করা চলিবে না। এই জন্যই বেনারস বাঁকুড়া দুই জায়গারই আহ্বান ফিরাইতে হইল।"

পত্র পাওয়া মাত্র মনোরঞ্জন কবিকে তাঁহার প্রতিশ্রুতিভঙ্গজনিত টমসনের বিরক্তির কথা লিখিলেন। ১৩ই মাঘ তারিখে এই প্রসঙ্গে তিনি যে জবাব দিলেন জীবনীর উপকরণ হিসাবে তাহা অতিশয় মূল্যবান। চিঠিখানি এই:

"কল্যাণীয়েষু, টমসন সাহেব বিরক্ত হইতে পারেন সেজন্য আমি দুঃখিত আছি। কিন্তু তোমরা ত আমাকে জান, তোমরা কি জন্য আমাকে অনাবশ্যক টানাটানি করিবার ইচ্ছা করিতেছ? আমার যে বয়স ও যে অবস্থা এখন আমার শক্তি সাবধানে ব্যয় করা দরকার। হাতে যে কাজ পড়িয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু করিতে গেলে সেই কাজের ক্ষতি হয়; কেন না আমার শরীরের সামর্থ্য এখন পরিমিত। পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লি-সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি—আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০ টাকার আয় দাড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিছু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে কর্ম্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সময়ে আমি যদি অতিশীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার উপর গ্রামে ওলাওঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে—আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহারো খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে। এ কথা মনে রাখিয়ো আমি বিশ্রাম করিতে পারিলে বাঁচিতাম—যে কাজের মধ্যে যাইতেছি তাহা আরামের নহে কিন্তু তাহা অত্যাবশ্যক—বাঁকুড়ায় যাওয়ার আবশ্যকতা সে জাতীয় নহে। অতএব আমার প্রতি অসন্তোষ ও বিরক্তিকে আমি শিরোধার্য্য করিয়াই মঙ্গলবার দিনে পতিসরে চলিয়া যাইব। সে জায়গা মনোরম নয়, স্বাস্থ্যকর নয়,

নির্জ্জন নয়, সেইজন্যই মন সহজেই সেখানে না যাইবার ছুতা খোঁজে—ইহার উপরেও তোমরা যদি সামান্য কারণে উপদ্রব করিতে চাও তবে তাহাতে আমার বোঝা বাড়াইয়া আমাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিবে। তোমরা আমাকে চেন, অতএব আমার উপর এই বিশ্বাস স্থির রাখিয়ো যে, আমি দেহমনকে সামাজিক দায়িত্ব হইতে যেটুকু বাঁচাইয়া চলি তার কারণ আলস্য নয়, তার কারণ, আমার উপর কাজের ভার আছে সে কাজ আমাকে নির্ব্বাহ করিতেই হইবে। [কলিকাতা] ইতি ১৩ মাঘ ১৩২২।

শ্রীঅতুল সেনকে লিখিত ৪নং পত্রের সঙ্গে এই পত্রটি যুক্ত করিলে সমস্ত ব্যাপার আরও পরিষ্কার হইবে। বারংবার ব্যর্থ হইয়াও আধুনিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি দেশের কাজে কায়মনোবাক্যে কী ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সেই ইতিহাস এখনও বিশদ ও সম্পূর্ণ ভাবে লিখিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। ইহার মধ্যে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানদ্বয় আজও পর্যন্ত স্ব স্ব অস্তিত্ব বার বার রূপ বদলের মধ্যেও বজায় রাখিয়া কবির একনিষ্ঠ উদ্যমের সাক্ষ্য হইয়া আছে।

বঙ্গবীণাপাণি ও বঙ্গপল্লীসমাজ—এই উভয়বিধ সেবার মধ্যেও সাংসারিক ও পারিবারিক সকল দায়িত্ব কবি ও কর্মী রবীন্দ্রনাথ কিরূপ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ তারিখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত প্রথম খণ্ড 'চিঠিপত্রে' আমরা তাহার বিস্ময়কর পরিচয় পাই। এই চিঠিগুলি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত। এই বিষয়ে কিছু উপকরণ জোগাইয়াছেন রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা সুধা দেবী। বসন্তবাবুকে লেখা (১৩০৭-০৮) রবীন্দ্রনাথের ছয়খানি পত্র তিনি আমাকে রবীন্দ্র-তিরোভাবের অব্যবহিত পরে দিয়াছিলেন। কবি যে এককালে আরও পাঁচজনের মত সাধারণ গৃহস্থ মানুষ ছিলেন, সংসারের তাড়নায় তাঁহাকেও যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত এবং প্রবল কর্মপ্রবাহের মধ্যে পড়িয়াও যে তিনি পিতার প্রতি পুত্রের এবং পুত্রকন্যার প্রতি পিতার কর্তব্য যথাযথ পালন করিয়া চলিয়াছিলেন, এবং সংসার পরিচালন বিষয়ে সহধর্মিণীকে সর্বদা সচেতন রাখিতেন রবীন্দ্র-জীবনের এ সকল অতি গূঢ় ও গুহ্য সংবাদ প্রচার হওয়া দরকার। 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ডে এবং নিম্নে মুদ্রিত পত্রগুলিতে সেই সকল সংবাদ আছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ সেন, মোহিতচন্দ্র

সেন ও জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা চিঠিপত্রেও কবির সংসারিক জীবনের বহু বিচিত্র সংবাদ আছে। বসন্তকুমার গুপ্তকে লিখিত চিঠিগুলি এই :

১। প্রিয়বরেষু আগামী মঙ্গলবারে মহারাজের [ত্রিপুরার] নিমন্ত্রণে দার্জিলিং যাইতেছি—…ফিরিতে বিলম্ব হইবে না। শরতের সহিত বিবাহ প্রস্তাব এখনো সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। ['অমুকে'র] বিবাহ হইয়া গেছে খবর পাইয়াছি।…

যদি সৎপাত্রের সন্ধান থাকে খবর দিতে ভুলিবেন না। ইতি ১৯শে বৈশাখ [১৩০৭ কুমারখালি]

২। আমার ছেলেদের শিক্ষাভার গ্রহণ করিতে যদি প্রস্তুত থাকেন তবে আমার পত্র পাইয়া বোলপুরে চলিয়া আসিবেন। [১৩০৭]

৩। সোমবার প্রাতে শিলাইদহে রওয়ানা হইতেছি। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আপনাকে অধিক কি আর বলিব—রথীকে সর্বতোভাবে দেখিবেন। আপনাকে স্পষ্টই বলিয়া রাখিতেছি [অমুকের] moral influence আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না।…ইতি শনিবার রাত্রি [১৩০৭]

৪। এখানে আসিয়া শুনিলাম শ্যামপুকুরে আপনার একটি কাজ হইয়াছিল। আমি ত তাহা জানিতাম না। শুনিতেছি তাহাতে আপনার অনেকগুলি সুবিধার কারণ ছিল। কেন নিলেন না? আমার মনে হয় এখনো এ বিষয়ে আপনার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বাবা মহাশয়ের সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে কথাবর্ত্তা হইল। তিনি শান্তিনিকেতনে অতিথিদের থাকা সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন। আমরাই নীচে উপরে বাহিরে সমস্ত স্থান জুড়িয়া থাকিব ইহা বোধ করি তাঁহার ভাল লাগে নাই। অথচ অতি শীঘ্রই আরো মাস্টারের আমদানি হইবে। আপনি এক কাজ করিতে পারেন। আমার এখানকার বাড়ি খালি পড়িয়া আছে। আপনি ইচ্ছা করিলে ইহার একতলার পশ্চিমদিগের ঘরটা আপনার পড়াশুনার জন্য ঠিক করিয়া লইতে পারেন। সম্পূর্ণ নির্জন পাইবেন। কোন ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা দেখি না। বোলপুরে আপনি অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে পড়াশুনা করিতে পারিতেন। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করিয়া সেখানকার সুবিধামত ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না। দিপু শীঘ্র শান্তিনিকেতনে যাইবেন তখন স্থানের টানাটানি দেখিলে তাঁহার

হয় ত বিরক্তি বোধ হইবে এই সকল চিন্তা করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি। বোধ হয় স্থানের অকুলান লইয়া এখানে আলোচনা হইয়াছে। [১৩০৮, শিলাইদহ]

৫।······এখানকার পুণ্যাহ সমাধা হইয়া গেছে—ইতিমধ্যে যদি বেলাকে মজঃফরপুরে পৌছিয়া দিবার জন্য ডাক না পড়ে তবে কালিগ্রামের পুণ্যাহ সম্পন্ন করিবার জন্য সেখানে রওনা হইব। সেখানে ২৪শে আষাঢ় দিন স্থির হইয়াছে। ইতি ১৪ই আষাঢ় ১৩০৮ [শিলাইদহ, কুমারখালি]

৬। অত্যন্ত ব্যস্ত। অদ্যই রেণুকার বিবাহ। আপনি আসিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম। পাত্রটির নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ডাক্তার। স্বভাব নির্দ্দোষ। দেখিতেও প্রিয়দর্শন।

প্রিয়র [প্রিয়নাথ সেন] সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। বোধহয় তাঁহারা লোক রাখিবেন না। প্রিয় নিজেই তাঁহার ছেলেকে পড়াইতেছেন।···২৪শে শ্রাবণ [১৩০৮, কলিকাতা]

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৫০) বাণীসাধক কবির অত্যুক্তি ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ উদ্দীপনা কর্মের ক্ষেত্রেও কেন প্রযুক্ত হয় তাহার একটি প্রায়-স্বগত কৈফিয়ত ১৯০৮ সন হইতে ১৯১৮ সন পর্যন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষক ৺কালিপদ বসুর নিকট লণ্ডন হইতে ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ (৭ই জুন ১৯১৩) তারিখে লেখা পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ হিসাবে এই পত্রটির মূল্য অসাধারণ। এই অমূল্য চিঠির প্রয়োজনীয় উদ্ধৃত অংশে কবি ও কর্মীর মনের দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। পত্রটি লিখিবার কারণ গোড়াতেই দেওয়া হইয়াছে। পত্রটি এই :

"তোমাদের মধ্যে কারো মনে এ রকম ধারণা হয়েছে যে নিজের সম্বন্ধে, বিদ্যালয়ের প্রতি আমার আর্থিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমি অত্যুক্তি করতে বসেছি এবং যে সব সঙ্কল্প মনের মধ্যে রেখে দেওয়া উচিত আমি তাই অযথাপরিমাণে প্রকাশ করচি। এই ভৎর্সনাবাক্য শুনে আমি চিন্তা করে দেখলুম এর মধ্যে সত্য আছে এবং তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া অন্যায় হয় নি। কিন্তু তবুও আমার নিজের দিকে যে একটা কথা বলবার আছে সেটা তোমাদের কাছে খোলসা করে বলা উচিত।· বরাবর আমি দেখে আসছি আমি কেবল কথা কয়ে কয়ে নিজেকে শিক্ষা দিয়েছি। নিজের

ভিতরে কোনো ভাল জিনিষ ভাব আকারে বা সঙ্কল্প আকারে দেখা দেবামাত্র সেটাকে প্রকাশ করার দ্বারাই আমি নিজের কাছে সেটাকে পরিস্ফুট করে তুল্‌তে পারি—সেটা আমার ভাষায় ব্যক্ত হতে হতেই উত্তরোত্তর আমার জীবনের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এটা বিশেষভাবে আমার স্বভাব। এই জন্যেই বস্তুত অধিকাংশ স্থলে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আমার অত্যুক্তি ঘট্‌তে বাধ্য। কারণ বর্ত্তমানে আমার শক্তির সীমা যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষার সীমা সেখানে নয়। আমার লক্ষ্য যেখানে আমার অবস্থিতি সেখানে হ্‌তেই পারে না। সেইজন্যে আমার মধ্যে যে মানুষটি সাধক সে আমার সংসারী মানুষের ভাষা অতিক্রম করে কথা কয়— কিন্তু তার কথা যদি আমি চাপা দিয়ে ফেলি তাহলে আমার এই সংসারী মানুসের আর পরিত্রাণ নেই। তার উচ্চারিত বাণী ক্রমশ আমার উপর জয়লাভ করতে থাকে। এমন অবস্থায় তোমরা যদি আমাকে বল যে যখন পারবে তখন কথা কোয়ো আগে থাকতে এ সব আলোচনা অসঙ্গত তাহলে সেটা আমার পক্ষে কল্যাণকর নয়— কেননা আমার স্বভাববশত কথাকওয়াই আমার সকলের চেয়ে প্রশস্ত পথ। কোনো পথিককে যদি বা বলা যায় লক্ষ্যে যখন পৌছবে তখনি পথে পা বাড়াবার সময় হবে তাহলে সে যেমন তাকে বাধা দেওয়া তেমনি আমার অন্তরতর যে প্রকৃতি আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে তার বাক্‌রোধ করলে সেটা আমার পক্ষে ব্যাঘাতস্বরূপ হয়। তাকে কথা বল্‌তে দিয়ে দিয়েই আমি শিখতে থাকি— একবার শুনেই ত শিক্ষা সমাধা হয় না— বারবার মাষ্টার মশায়ের মুখ থেকে পাঠ নিতে নিতে তবেই বিষয়টা সহজ ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমার অতীত জীবনে এই পন্থার উপযোগিতা আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। বারবার দেখেছি, জীবনের ক্ষেত্রে কোনো জিনিষের প্রকাশের বহু পূর্ব্বে বাণীর ক্ষেত্রে তার অভ্যুদয় হয়েছে— তার কারণ ঠিক অহঙ্কার নয়— তার কারণ আমার বাক্যের প্রকাশ আমার জীবনের প্রকাশের অঙ্গ। আমার এই জীবনের প্রক্রিয়া এমনি নিগূঢ় যে অনেক সময়ে এ আমার অগোচরে হয়ে থাকে। এজন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা কোরো— আমার কথা কওয়াটাকে আমার একটা অপরাধ বলে গণ্য কোরো না— কেননা ওটা আমার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ফুল নিঃশব্দে ফোটে কিন্তু নদী নিঃশব্দে চলে না কেননা তার চলা এবং বলা এক সঙ্গেই ঘট্‌তে

থাকে— এ স্থলে নদীকে ফুলের দৃষ্টান্ত দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া নদীকে ব্যর্থ হতে দেওয়া। পদধ্বনি দূরের থেকে শোনা যায়, বলা জিনিষটা চলার চেয়ে এগিয়ে যায় কিন্তু সেটুকু সহ্য করতেই হবে— যার যা ধর্ম্ম তাকে সেই পথ দিয়েই সার্থকতা লাভ করতে হবে। আমি যে পথ-চল্তি মানুষ— যখন হঠাৎ বাঁক ফিরি তখন নতুন দিগন্তে নতুন দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়ে তখন সেটা আমার সঙ্গে সমস্ত চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে তোলে— তখন আমি সেই দৃশ্যে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আনন্দগান জুড়ে দিই। কেননা এই গানে পথ চলবার বল দেয় ক্লান্তি দূর করে। বৈষয়িক মানুষরা তাদের বৈষয়িক সংকল্প নিয়ে আলোচনা করে, সেই আলোচনা দ্বারা তাদের সংকল্প সুস্পষ্ট হতে থাকে এবং শক্তি লাভ করে—সে সংকল্প পরে ব্যর্থ হতেও পারে কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যাই হোক্, যানবাহনের প্রণালী নানারকমের— কোনো জাহাজ পালে চলে, কোনো জাহাজ ষ্টীমে চলে—কেউ বা দাঁড় লাগায়, কেউ বা গুণ টানে— চলবার ঠিক পথটা কি সে উপদেশ বাইরে থেকে দেওয়া বড় শক্ত— এই জন্যেই গুরুগিরিকে আমি সব চেয়ে ভয় করি। তোমাদের কাছে আমি অনেক সময়েই অনেক বড় কথা হয় ত অনেক বাহুল্যসহকারে বলে থাকি কিন্তু নিশ্চয় জেনো তার মধ্যে যদি উপদেশের অংশ কিছু থাকে তবে তার প্রধান শ্রোতা আমি। আমি নিজে যদি সেটা সম্পূর্ণ পরিমাণে পেতুম তাহলে হয় ত কথা বলতুমই না— পাইনে বলেই শব্দ করি— বস্তুত এ একরকম প্রার্থনা— নিজের বাক্যের দ্বারা নিজেকে জাগিয়ে রাখা। কেবল ব্যক্তিগত মানুষ কেন বিশ্বমানুষের ইতিহাসে এটা আমরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্চি— মানুষের কথা যেখানে পৌঁছচ্চে মানুষ সেখানে এখনো পৌঁছয় নি কিন্তু কথাকে মানুষ যদি এগতে না দিত তাহলে তাকে পথ দেখাবার কোনো লোক থাকৃত না। মানুষের বাতি মানুষের চেয়ে এগিয়ে থাকে বলেই তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে— যদি সেটা পিছিয়ে থাকে তাহলে সেটা সামনের দিকে ছায়া ফেলে। আমাদের প্রকৃতির যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সেটা আমাদের চেয়ে এগিয়ে এগিয়েই চলে। কিন্তু এ নিয়ে বেশি তর্ক করা কিছু নয়। আসল কথা আমাকে এ কথা বার-বারই বল্‌তে হবে যে ঈশ্বরের কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করব— যদিও কাজের ক্ষেত্রে সেই আত্মসমর্পণ যথেষ্ট বাধা পাচ্চে— আমাকে

বারবার বল্‌তে হবে যে টাকার থলির উপর ভরসা না রেখে আধ্যাত্মিক মঙ্গলশক্তির উপর আস্থা রাখ্‌তে হবে যদিও টাকার থলি মনের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে তাকে সহজে নামানো যাচ্চে না। কিন্তু একথা যে জীবনের গম্ভীর মর্ম্মস্থান থেকে উঠ্‌তে চাচ্চে— বাইরের বাধাকেই সত্য বলব আর সেই বেদনাকে সেই প্রেরণাকে কি অবিশ্বাস করতে হবে? অন্তর্যামী যেদিক থেকে আমাদের সত্যকে দেখেন সেইদিক থেকেই কি সত্যকে আমল দিতে হবে না? প্রকাশের চেষ্টার মধ্যে যে বেগ আছে সেই বেগের দ্বারা যে আমাদের অনেক বাধা ক্ষয় হতে থাকে— আমাদের অন্তরতম জীবনের বাণীকে ব্যক্ত করার দ্বারা আমাদের বাইরের দিকের আবরণকে আমরা ক্রমে ক্রমে কাটিয়ে উঠ্‌তে থাকি। অবশ্য অন্তরের মধ্যে যদি মিথ্যা থাকে তাহলেই কথা কেবল কথামাত্র হয়— সে কথা বাধা কাটায় না, বাধা সৃষ্টি করে— আমাদের কথা যদি অহঙ্কারের প্রকাশ হয় আত্মার প্রকাশ না হয় তাহলে তার চেয়ে দুর্গতি আর কিছু নেই। আমার মধ্যে সে অহঙ্কার হয় ত আছে কিন্তু অহঙ্কারকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করে আমার সত্যকে বাধামুক্ত করবার জন্যে আমার জীবনের একান্ত উৎকণ্ঠা সত্য কি না সে সম্বন্ধে আমার অন্তর্যামীর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে— তিনিই জানেন যাঁকে আমি ডাক্‌চি— সে ডাক তাঁর কাছেই পৌঁছচ্চে— এবং তোমাদের কাছে যাকিছু বলে ফেলচি সেও বস্তুত তাঁরই কাছে আমার নিবেদন— আবিরাবীর্ম্মএধি।"

ইহার অব্যবহিত পরেই কবির নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়।

সংযোজন

১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১৯৩৯ খ্রীঃ) যখন "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী" লিখিতে ও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্ররচনাবলী'র অচলিত সংগ্রহ সম্পাদন করিতে ছিলাম, তখন কেমন করিয়া কোথা হইতে মনে নাই রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র ও পত্রাংশ আমার হস্তগত হয়, ওই সঙ্গে অপরের লেখা একটি ইংরেজীপত্রও ছিল। নিজের অনবধানতাবশতঃ সেই সময়েই অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে এই পত্রগুলি চাপা পড়ে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সেগুলি খুঁজিয়া পাই নাই। হঠাৎ

১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসেই সেগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে খুঁজিয়া পাই। পত্রগুলি কাহাকে বা কাহাদের লেখা আজ অনুমানও করিতে পারিতেছি না। কিন্তু বিশদ বিবরণী ব্যতিরেকেও যে এগুলি রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান তাহাতে সংশয় নাই বলিয়াই এই অধ্যায়ের "সংযোজন" হিসাবে পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ কী পরিমাণ ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন তিনখানি পত্রে তাহার পরিচয় আছে। পত্রগুলি একান্তভাবে বৈষয়িক, সেইজন্যই জীবনীকারের পক্ষে ইহাদের মূল্য বেশী। পত্রগুলি ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে কি না তাহাও আমার জানা নাই।

পত্র (১)

[শান্তিনিকেতন]

প্রিয়বরেষু,

আপনার প্রেরিত দান এই মাত্র পাইয়া কত খুসি হইলাম বলিতে পারি না। এই পঞ্চাশটি টাকার সঙ্গে আপনার যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়াছেন তাহা আমার হৃদয়ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইল। রাজা মহারাজেরা অনুগ্রহ করিয়া মনোরথ পূরণ করিলেও বন্ধুত্বের আনুকূল্যের মত তাহা এমন মধুর বোধ হয় না—আপনি হৃদয়ের সঙ্গে দিয়াছেন, আমি আপনাকে হৃদয় প্রত্যর্পণ করিতেছি। আপনি মঙ্গলকার্য্যে সহায়তা করিলেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। একবার অবকাশমত শান্তিনিকেতনে আসিবেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন কেবল যে বন্ধুকে সহায়তা করিলেন তাহা নহে দেশের মঙ্গলকর্ম্মে যোগদান করিলেন।

শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় একদিন দস্যুতা হইত জানেন বোধ হয়। আজকাল আমিই প্রধান দস্যু সাজিয়া এখানে বসিয়া আছি, যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে রাজামহারাজরা পালাইয়া রক্ষা পাইবেন, কেবল বিশ্বস্ত বন্ধুদেরই পালাইবার রাস্তা নাই। ইতি ২৫শে মাঘ ১৩০৮

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (২)

ওঁ

প্রিয়বন্ধুবরেষু,

ঈশ্বর আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন—এক্ষণে আমাকে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। আপনার দ্বারে আমার এই প্রার্থনা যে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের একটি ছাত্রের ব্যয়ভার আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অধিক নহে, বৎসরে ১৮০ টাকা। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যদি এই টাকাটি দেন তবে তাহা আমার পরলোকগতা পত্নীর মৃত্যুবার্ষিক মঙ্গলদান বলিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিব এবং তাহাতে ঈশ্বর আপনারও কল্যাণ করিবেন।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (৩)

ওঁ

[কলিকাতা]

প্রিয়বরেষু,

আমাদের আত্মীয় এবং কুষ্টিয়া মোকামের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে আপনার কাছে পাঠাইতেছি। এবারে আমাদের অঞ্চলে সুবৃষ্টি হওয়ায় যথেষ্ট পাট আশা করিতেছি। কাজ করিতে ইচ্ছা করেন! কল আছে, লোকও এবার ভাল, বৎসরও আশাজনক, যদি মনোযোগ করেন তবে আপনার তাহাতে ক্ষতি হইবে না এবং আমাদেরও না হইবার কথা। মহেন্দ্র দাস আমাদের সহিত কাজের বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। আপনি কি বলেন? একবার না হয় আপিসের যাইবার পথে সাক্ষাৎ করিয়াই যান্ না। আমার যানবাহনের ঐকান্তিক অভাববশতঃ ফস্ করিয়া কোথাও নড়িতে চাই না—নহিলে গরজের তাড়ায় আজই হাজির হইব সংকল্প ছিল। বিরক্ত করিলাম কিছু মনে করিবেন না—আপনিও করিলে আমি মার্জ্জনা করিব। ইতি বুধবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (৪)

ওঁ

[কলিকাতা]

প্রিয়বরেষু,

পত্রবাহক আমার শ্যালক শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। দীর্ঘকাল কুষ্টিয়ায় থাকিয়া পাটের কর্ম্ম করিয়াছেন। আপনার যদি পাটের কারবার সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন থাকে ও ইঁহার পরে সেই বিশ্বাস স্থাপন করেন তবে আশা করি আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে না। আপনার প্রয়োজন যদি না থাকে তবে বন্ধুবান্ধবের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ইঁহাকে যদি কোনো কাজের সূত্রে জড়িত করিয়া দিতে পারেন তবে ভদ্র ব্রাহ্মণের উপকার করা হইবে। ইনি এণ্ট্রেন্সে উত্তীর্ণ।

আপনি জুরির হাজ্‌রি দিতে কবে হইতে যাইবেন? একসঙ্গে যাতায়াত করিলে ক্ষতি কি আছে? ইতি বৃহস্পতিবার

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র (অংশ) (৫)

······সমস্যা আছে।

পুরীতে আমার যে জমি ও গোটাকতক ঘর আছে তাহাতে বাসযোগ্য বাড়ি করিয়া দিলে অনেক টাকা ভাড়া [পাওয়া] যাইতে পারে সেখানকার বন্ধুবান্ধবেরা এইরূপ বলেন। রথীরা দেখিয়া আসিয়াছে সেখানে অতি সামান্য ঘরে প্রত্যহ দেড়টাকা দুইটাকা ভাড়া পাওয়া যায়। হাজার পাঁচেক খরচ করিলে মাসে ১০০২ কাছাকাছি ভাড়া পাইবার কথা। বিদ্যালয়ের fund হইতে এই বাড়িটা করিয়া দিলে কিরূপ হয়? তা যদি না হয় সেখানকার ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছিলেন কুমার শরৎ সিংহ পুরীতে জমি কিনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। যদি হাজার তিন চার টাকা পাওয়া [যায়] তবে তাঁহাকে বেচিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করা যাইতে পারে। তুমি কাহাকেও দিয়া শরৎ সিংহের নিকট যাচাই করিতে পার? ২৬শে বৈশাখ

রবিকাকা

পত্র (৬) (রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত পত্র)।

9th May 1904

[২৮ বৈশাখ ১৩১১]

My Dear Radharaman,

You are probably aware that Rabi Babu has got some land with a building on it on the seaside at Puri. He intends to repair and add to the building in order to make it suitable for his accommodation. But the succession of mishaps in his family has taken him down completely—and he has given up all ideas of pleasure and enjoyment. He is therefore desirous of selling off the place and make over the proceeds in aid of his School. He has heard from the magistrate of Puri that Kumar Sarat Chandra Sinha of Paikpara is anxious to secure some land on the seaside at Puri. If this is true can you enquire if Rabi Babu's place will suit him. I have not seen it myself but have been told that the site is excellent in the midst of the European quarter and it will not be easy for the Kumar to secure a more favourable site. If the Kumar approves there need be no difficulty about the price—for Rabi Babu does not want the money himself but for the School. Will you enquire and let me know as soon as you can.

I enclose Rabi Babu's letter.

Yours sincerely
Ramani Mohan Chatterjee

রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। মনে হয় পূর্ববর্তী পত্রাংশ তাঁহাকেই লেখা। খুড়শ্বশুর হিসাবে রবীন্দ্রনাথ "রবিকাকা" লিখিয়াছিলেন। উক্ত পত্রাংশ রমণীমোহনকে লিখিত হইলে উহার তারিখ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে, ২৬শে বৈশাখ ১৩১১।

প্রথম আলোর চরণধ্বনি

যে কবির খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে তিনি পূর্বগামীদের অনুকরণ ও অনুসরণের দ্বারা বাণীসাধনা শুরু করিয়াছেন ইহা পাথুরে প্রমাণ সম্বলিত অকাট্য ইতিহাস হইলেও কাব্যসম্মিত সত্য হইতে পারে না। মহাকবি বাল্মীকি "মা নিষাদ···" দিয়াই যাত্রা আরম্ভ করিবেন, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ"—বিদ্রূপ সহধর্মিণীর নিকট কিংবদন্তীমূলক এই মিনতির মধ্যেই মহাকবি কালিদাসের চারিটি কাব্যের সূচনা নিহিত থাকিবে। শিশু বা নিতান্ত বালক রবীন্দ্রনাথের "দ্বিরেফ" শব্দ শোভিত পদ্ম বিষয়ক, বর্ষাসমাগমে মীনগণের হীনাবস্থা মোচন বিষয়ক অথবা আমসত্ত্ব-কদলী-সন্দেশ বিষয়ক রচনা আলেকজাণ্ডার পোপের (?) "Mother mother, mercy take I will never verses make" অথবা কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের "রেতে মশা, দিনে মাছি, এই তাড়িয়ে কলকেতায় আছি" পর্যায়ের পদ্য বা ভার্স মাত্র, কাব্য নয়। শিশু, বালক বা কিশোর রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতা বা কাব্যাংশ এতাবৎকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' বা অন্যত্র যে সকল কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সবগুলিই যে কালিদাস-শেক্সপীয়ারের অনুবাদ এবং মধুসূদন-বিহারীলাল-হেমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয় চৌধুরীর অনুকরণ অথবা সবগুলিই যে নিছক ভার্স বা পদ্য ইহা মানিতে হইলে প্রত্যূষের অরুণাভার মধ্যে মধ্যাহ্ন-রবির দীপ্তির সম্ভাবনাকেও অস্বীকার করিতে হয়। যে প্রেরণায় প্রকাণ্ড সূর্যোদয়ের পূর্বেই পূর্বদিগন্ত রাঙিয়া উঠে সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা কবির প্রথম আত্মপ্রকাশের মধ্যে নিশ্চিত ভাবে না থাকিলে সেই কবিজীবন শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সচরাচর আমরা দেখিতে পাই বাল্যকালে সকল কবির দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি পূর্বগামীদের প্রভাবেই রচিত হইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া কবি যদি পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা হইলে সংক্রামক ব্যাধির মত পরাধীনতা-পাশ ছেদনের আবেগ বা জ্বর তাঁহাকে আক্রমণ করেই। রবীন্দ্রকাব্যের আদি-পর্বের হিন্দুমেলায় পঠিত বা পঠিত হইবার জন্য রচিত কবিতাগুলি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে সন্নিবিষ্ট গান বা কবিতাগুলি, ভারতবিষয়ক ও 'প্রকৃতির খেদ' শীর্ষক কবিতা নিঃসংশয়ে এই পর্যায়ে সংক্রামিত কবিতা। সর্বপ্রথম মুদ্রিত গান "একসূত্রে বাঁধিয়াছি—"

ও সর্বপ্রথম মুদ্রিত বেনামী কবিতা "অভিলাষ"ও ওই পর্যায়েই পড়ে। প্রাথমিক কবিতাগুলির তালিকা মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায় :

১। একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' নাটকে ১৮৭৪, ৯ই জুলাই।

২। অভিলাষ—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৭, নবেম্বর-ডিসেম্বর।

৩। "হিন্দুমেলার উপহার"—'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় স্বনামে ১৮৭৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারি।

৪। প্রকৃতির খেদ—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৭৫, জুন।

৫। জ্বল্ জ্বল্ চিতা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে ১৮৭৫, ৩০ নবেম্বর।

৬। প্রলাপ (১. ২, ৩) 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' ১৮৭৬, ২৫ ফেব্রুয়ারি হইতে।

৭। দেখিছ না অয়ি ভারতসাগর—১৮৭৭ সনে হিন্দুমেলায় পঠিত; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকে ১৮৮২।

৮। অয়ি বিষাদিনী বীণা—'জাতীয় সঙ্গীত' প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংস্করণে ১৮৭৮, ৩০ আগষ্ট।

৯। ভারত রে তোর কলঙ্কিত—ঐ ঐ ঐ ১৮৭৮, ৩০ আগষ্ট।

এই তালিকায় অনুবাদ কবিতাগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আন্দাজ ১৮৭৩-৭৪ সনে অনূদিত ও পরবর্তীকালে 'ভারতী'র "সম্পাদকীয় বৈঠকে" প্রকাশিত 'ম্যাকবেথ' ও 'কুমারসম্ভব' হইতে অনুবাদ বাদ দিয়াছি। ১২৮৪ শ্রাবণ (১৮৭৭ জুলাই) হইতে প্রকাশিত 'ভারতী' মাসিকপত্রকে ঐতিহাসিককালের কীর্তির মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে অর্থাৎ "তোমারি তরে মা সঁপিনু" প্রভৃতি গান এবং 'শৈশব সঙ্গীত' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র কবিতাগুলি তালিকায় ধরা হয় নাই।

উপরোক্ত কবিতাগুলির মধ্যে "প্রথম আলোর চরণধ্বনি" শুনিতে পাইলে আমিই সর্বাধিক খুশী হইতাম, কারণ ৩নং "হিন্দুমেলার উপহার" এবং ৫ ও ৬নং "জ্বল্ জ্বল্ চিতা" ও "প্রলাপ" কবিতা দুইটি ছাড়া বাকি ছয়টি বেনামী কবিতা বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া আমিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত করি। রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত তৃতীয় কবিতাটি পুরাতন দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ঘাঁটিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার

করেন। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৫৮০-৮১ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত করেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের তাহা পূর্বেই প্রচারিত ছিল। আমি ১৯৩৯ সনে এই সন্ধান-কার্যে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পাইয়াছিলাম এবং আবিষ্কারের সংবাদ সে সময় বাংলাদেশের যাবতীয় সংবাদ-পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় শিরোনামায় ঘোষিত হইয়াছিল। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের "শনিবারের চিঠি'তেও "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী" (বর্তমান গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট) নামে এইগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করি। এই সামান্য ঘটনাটির উল্লেখ অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কারণে করিতে হইতেছে যে পরবর্তী রবীন্দ্রগবেষকেরা অনবধানতাবশতঃ রবীন্দ্রসাগর-সেতু-বন্ধনে এই অধম কাঠ-বিড়ালীর সামান্য সাহায্যটুকু স্মরণে রাখেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বহস্তের পাকা দলিলে আমাকে স্বীকৃতি দিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ শেষে দলিলটি সংযোজিত হইল।

যাহা হউক, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাক্‌'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যুগের কবিতাগুলিকে আমল দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'কেও বাদ দিতে পারিলে তিনি খুশী হইতেন কিন্তু ভাবের দিক দিয়া এই কাব্যেই সর্বপ্রথম তাঁহার নিজস্বতা ফুটিয়াছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তিনি এইগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'কড়ি ও কোমলে'ই তাঁহার নিজস্ব ভাব স্বকীয় রূপ বা ফর্ম লইয়া বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেইখান হইতেই তাঁহার কাব্যরচনাবলীকে তিনি অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিতে রাজী হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে। ছাপাখানা ঐতিহাসিকের সহায়। সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম, ছাপাখানা তার প্রবল বাধা। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেই গুলিই কাব্য। আমার রচনায় আমি তাদেরই স্বীকার করতে চাই। বাকি যত ক্ষীণ বাষ্পীয় ফাঁকগুলি যথার্থ সাহিত্যের শামিল নয়। ঐতিহাসিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ; বাষ্প, নক্ষত্র, ফাঁক কোনোটাকেই সে বাদ দিতে চায় না।"

কবির নিজের কাব্য সম্বন্ধে নির্মম মত আর একটি বাক্যে ঘোষিত হইয়াছে—"অরণ্যকে চেনাতে গেলেই জঙ্গলকে সাফ করা চাই, কুঠারের দরকার।" জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু

জীবনীলেখক হিসাবে আমাদের মত অনুরূপ, সাহিত্য-সৃষ্টির এই অরুণযুগকে রবীন্দ্র-কাব্যজিজ্ঞাসা হইতে বর্জন করিবার অধিকার আমাদের নাই। রবীন্দ্রপ্রতিভা উন্মেষের সূচনা হয় এই যুগেই।"

প্রতিভা-উন্মেষের বিশেষ পরিচয় কিন্তু এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত আদি-পর্বের কবিতাগুলিতে ফুটিয়া উঠে নাই। "অভিলাষ" কবিতার

"অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।"

অথবা "প্রকৃতির খেদ"-এর

"সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগর তলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।"

প্রভৃতি বালকের রচনা হিসাবে চমক লাগায় বটে, কিন্তু কাব্যের জাদুস্পর্শে মনকে অভিভূত করে না।

সর্বপ্রথম এই জাদুর ছোঁয়াচ মেলে "অবসাদ" শীর্ষক একটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত কবিতায়। প্রভাতকুমার তাহার 'রবীন্দ্রজীবনী' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথমখণ্ডের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মালতীপুঁথি হইতে "একটি কবিতার কিয়দংশ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"হে কবিতা—হে কল্পনা
জাগাও-জাগাও দেবি উঠাও আমারে দীনহীন
ঢাল এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল—" ইত্যাদি।

প্রভাতকুমার বলিয়াছেন, "কবিতাটি আমেদাবাদে ১৮৭৮ জুলাই ৬ তারিখে লিখিত।"

মালতীপুঁথি আমি দেখি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কবিতাটি ১২৯২ সালের চৈত্র মাসের 'বালক' পত্রিকার ৫৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায় "অবসাদ" শিরোনামায় মুদ্রিত দেখিয়াছি। কবিতাটির শেষে "বালক" রচিত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখ যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকৃত তাহাতে সংশয় নাই। কারণ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নামে সম্পাদক থাকিলেও আসলে রবীন্দ্রনাথই সম্পাদক, পরিচালক ও কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাই আমাদের মনে হয় মালতীপুঁথির প্রভাতবাবু কর্তৃক প্রদত্ত তারিখে কিছু ভুল আছে। ১৮৭৮ সনের ৬ই জুলাই তারিখে লিখিত

কবিতা ১৮৮৬ সনের মার্চ মাসে পত্রস্থ করিয়া তাহাকে বালকের লেখা বলিয়া জাহির অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ করিবেন না। পৌনে পঁচিশ বৎসরের যুবক সোওয়া সতের বৎসরের যুবাকে "বালক" বলিয়া অবজ্ঞা করিতেই পারেন না। সূচীপত্রেও "বাল্যকালের লেখা" বলা হইয়াছে। কবিতাটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিতেছি।

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও—জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন!
ঢাল' এ হৃদয় মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল!
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;
নির্জ্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল!
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারি দিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নির্জ্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে;
এস দেবি, এস, মোরে
রাখ এ মূর্চ্ছার ঘোরে;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাওগো উঠায়ে!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ও গো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জ্বলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত!
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন—চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবী-তলে—অকর্ম্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!

পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্ম্মের অনুষ্ঠান!
দুর্গম উন্নতি পথে পৃথ্বি তরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোগুম, অবসন্ন, দুর্ব্বল পথিকে
করগো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে!

ইহা কবির সম্পূর্ণ নিজের সুর, প্রথম আলোর চরণধ্বনি। আমার অনুমান এই কবিতার রচনাকাল আরও অন্ততঃ চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে, কবিতাটি "অভিলাষ" কবিতার সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। রবীন্দ্র-কাব্য-মহীরুহের সদ্যজাত দ্বিদল অঙ্কুর—"অভিলাষ" ও "অবসাদ"। কবি স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ব্যর্থ ও কবিতার অজস্রতায় সার্থক এইকালের কথা এই ভাবে বলিয়াছেন—

"বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার না আর-কাহারও মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেখাও তেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্প আছে—সেই বাষ্পভরা বুদ্বুদরাশি, সেই আবেগের ফেনিলতা, অলস কল্পনার আবর্তের টানে পাক খাইয়া নিরর্থক ভাবে ঘুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের সৃষ্টি নাই, কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু যাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অন্য কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা দুরন্ত আক্ষেপ। যখন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তখন সে একটা ভারি অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা।"

এই "অশান্তি···আক্ষেপ···অন্ধ আন্দোলনের অবস্থা"য় "অবসাদ" কবিতাটি লেখা। একদিকে আত্মীয়স্বজনের তাঁহার সম্বন্ধীয় "উচ্চ অভিলাষ"কে ধিক্কার দিয়া বালক-কবি বলিতেছেন—

"জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ।
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।"

অন্যদিকে নিদারুণ অবসাদের মধ্যে বাণী-বীণাপাণির শরণ লইয়া বলিতেছেন—

"জাগাও জাগাও দেবি, উঠাও আমারে দীনহীন।...
ক্রমে অবসন্ন হোয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন—প্রাণহীন—জনহীন—মরু মরু মরু—
আঁধার—আঁধার সব—নাই জল নাই তৃণ তরু,—
নির্জ্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে।"

চারিদিক দিয়া লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত কবি একমাত্র কাব্যসরস্বতীর কৃপাপ্রার্থী—

"অজ্ঞাত পৃথিবী-তলে—অকর্মণ্য—অনাথ—অজ্ঞান—
উঠাও উঠাও মোরে—করহ নূতন প্রাণ দান!
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম।"

বালক-কবির এ ব্যাকুল প্রার্থনা দেবী যে শুনিয়াছিলেন কালের প্রস্তর-পটে তাঁহার অক্ষয় নাম তাহার প্রমাণ দিতেছে। এই ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনা অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, উহা অবসন্ন কবির একান্ত হৃদয়ের কথা—নিজের কথা। প্রথম আলোর সুনিশ্চিত চরণধ্বনি ইহা।

উপরে 'জীবনস্মৃতি' হইতে যে সময়ের কথা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেছে পিতার সহিত প্রথম শান্তিনিকেতন ও হিমালয় ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরের কাল। ১৮৭৩ সনের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসেন—তখন তাঁহার বয়স বারো বৎসর মাত্র।

১৮৯৮ সনের ২৯ জানুয়ারি তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না।"

এই দ্বন্দ্ব সেই বাল্যের "অবসাদ" ও "অভিলাষে"র দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই আমরা পরবর্তী কালে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাতসঙ্গীতে'র দ্বন্দ্বরূপে দেখিতে পাই; 'মানসী' এবং 'কড়ি ও কোমলে' সেই একই দ্বন্দ্ব।

প্রথম-আলোর-চরণধ্বনি-"অবসাদে"র প্রদীপ্ত ভাস্বর রূপ আমরা দেখিতে পাই দীর্ঘকাল পরে লেখা (২৩ ফাল্গুন, ১৩০০) 'চিত্রা'র "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায়। সেখানে কবি বলিতেছেন :

"এ দৈন্যমাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।
এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
রেখো না বসায়ে আর। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে ক'রো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন ; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর ; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জলে ক্ষুধানল। যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা। সে-বাঁশিতে শিখেছি যে-সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের এক প্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা

স্বর্গের অমৃত লাগি—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ।"

বালক-কবির "অবসাদে" ইহারই প্রথম চরণধ্বনি শুনিতে পাই—

"দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া,—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী!
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত!
মুমূর্ষু মনের ভার—পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন—বলহীন—চেতনারহিত।"

রবীন্দ্র-কাব্যের আদি পর্বের বিচার-বিশ্লেষণ করিতে করিতে হঠাৎ এই "অবসাদে" আসিয়া সাহিত্যরসিকের চিত্ত বিস্ময়বিমুগ্ধ ও উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং কবিরই পরবর্তী গানের ভাষায় তাঁহাকে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"নীল অতলের কোথা থেকে উদাস তারে করল যে কে।
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক-ঠিকানা নেই॥
'সুপ্তিশয়ন আয় ছেড়ে আয়' জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে, 'চল আছে যেথায় সাগরপারের বাসা।'
দেশবিদেশের সকল ধারা সেইখানে হয় বাঁধনহারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃসমুদ্রেই॥
প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই॥"

ঠাকুরবাড়ির নিভৃত গৃহকোণের ভীরু প্রদীপশিখা শেষ পর্যন্ত জ্যোতিঃসমুদ্রেই শুধু লীন হয় নাই, জ্যোতিঃসমুদ্রকে আলোড়িত উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথম-আলোর-চরণধ্বনি এই "অবসাদ" কবিতায় ভাস্বর জ্যোতির সূচনা যে লুক্কায়িত আছে তাহা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করা যায়, কারণ অবসন্ন বলহীন ভগ্নোদ্যম বালক-কবির বাগ্‌দেবীর কাছে সেদিনের প্রার্থনা—

"কালের প্রস্তর-পটে লিখিব অক্ষয় নিজনাম"—

ব্যর্থ হয় নাই।

সংযোজন

রবীন্দ্রনাথের অনামা ও বেনামা রচনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময়ে রবীন্দ্রনাথকে দিয়া তাঁহার বহু নামহীন রচনার মৎকর্তৃক প্রস্তুত তালিকায় সহি করাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সময়েই তিনি উপরে উল্লিখিত দলিলটি লিখিয়া দেন। তাঁহার জীবিতকালে ইহা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এখন হইতেছে।

দলিলটি এই :—

শ্রীমান সজনীকান্ত দাস আমার বাল্য ও কৈশোরের বেনামী রচনাগুলি আবিষ্কার করে আমাকে বিস্মিত করেছেন। পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমার সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচনা "অভিলাষ" তাঁহার অভিনব আবিষ্কার। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটেছিল। জ্যোতিদাদার প্রথম চারটি নাটকের অধিকাংশ কবিতা এবং গান যে আমারি রচনা তা সজনীকান্তের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়ায় নি। হিন্দুমেলায় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে আমার পঠিত কবিতাটি 'স্বপ্নময়ী'তে আত্মগোপন করেছিল সেটাও সজনীকান্তের ইঙ্গিতে ধরা পড়েছে। সজনীকান্তপ্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকাকৃত রচনাগুলি নিঃসংশয়রূপে আমার। কিন্তু পরবর্তী তালিকার রচনাগুলি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারি নি। আমি যে দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য ও অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর ইত্যাদি ছদ্মনামে এককালে অনেক লেখাই লিখেছি তা জেনেও বেশ কৌতুক বোধ করচি। এখানে বলা আবশ্যক শেষোক্ত নামটি কোনো লেখক অন্য কোনো কোনো রচনায় আত্মসাৎ করেচেন বলে আমার সন্দেহ হচ্চে।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১।১১।৩৯

তালিকা দুইটি এই গ্রন্থের শেষ ভাগে "রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী" নিবন্ধে দ্রষ্টব্য।

“রবির পূর্ণ উদয়”

নিতান্ত শৈশবকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার খ্যাতি পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে বিস্তার লাভ করে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৪৭৪) “পিতৃস্মৃতি” প্রবন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবী লিখিয়াছেন: “রবির গান শুনিতে তিনি [মহর্ষি] ভালবাসিতেন। বলিতেন রবি আমাদের বাঙ্গালাদেশের বুলবুল।” এই বুলবুলকে ১২৯৩ সালে পঁচিশ বৎসর বয়সে সেই বৎসর মাঘোৎসব উপলক্ষে রচিত ও গীত “নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে” প্রভৃতি গানের জন্য মহর্ষি কি ভাবে পাঁচশত টাকার একটি চেক দিয়া পুরস্কৃত করেন সে কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, “দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত. তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে-কাজ করিতে হইবে।”

বাহিরের খ্যাতি তখনই কবি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার সাড়ে চার বৎসর পূর্বেই ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৮২ জুলাই) ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর সহিত রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহ-সভায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র কবিকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক নিজের গলার মালা দিয়া স্বীকৃতি দানের ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটিয়া গিয়াছে। সঙ্গীতের জন্য রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা ও অভিনয়ের জন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি রাজকৃষ্ণ রায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অযাচিত অকুণ্ঠ প্রশংসাও কবি লাভ করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বালক ও কিশোর রবীন্দ্রনাথ রচিত কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা লইয়া কবিকে কম প্রশংসা করেন নাই।

১২৯০ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ রবিবার (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩) মহর্ষির এস্টেটের কর্মচারী খুলনা দক্ষিণডিহির বেণীমাধব রায়চৌধুরীর দশ বর্ষীয়া কন্যা ভবতারিণীর সহিত বাইশ বৎসর সাত মাস বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের বিবাহ

হয়। কন্যার নাম পালটাইয়া মৃণালিনী করা হয়। এই বিবাহ-সম্বন্ধ যে অন্ততঃ আট মাস পূর্বে স্থির হইয়াছিল ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী'তে (পৃ. ৭৯-৮৪) প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "যৌতুক কি কৌতুক" কবিতার পরিশিষ্ট "ছদ্ম-বেশধারী উৎসর্গ—এক কথায়—উপসর্গ"ই তাহার প্রমাণ। পরিশিষ্টটি এই—

"শর্বরী গিয়াছে চলি'! দ্বিজ-রাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ উদয়।
গন্ধহীন দু-চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিষিয়া তারে
'অনিন্দিতা স্বর্ণমৃণালিনী হোক্
স্থবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মন্ত্রজার কারে
যে পড়ে সে পড়ুক খাইয়া চোক॥'"

এই আশীর্বাদী কবিতায় রবীন্দ্র-ভবতারিণী-বিবাহে কেহ যে বাদ সাধিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আমার আলোচনা সে প্রসঙ্গে নয়। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ পূর্ণ বাইশ বর্ষ বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবির পূর্ণ উদয় প্রতীক্ষা করিতেছেন, শর্বরী অতিক্রান্ত হইয়াছে—এই অধ্যায়ে সেই আলোচনাই করিব।

ঠিক এই কালে "রবির পূর্ণ উদয়" একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ও আঘাতের অপেক্ষায় ছিল। বিবাহের মাত্র সাড়ে চার মাস পরেই ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে অতর্কিতে সেই "দুঃসহ আঘাত" আসিল—নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক আত্মঘাতে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন:

"জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা।... এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনই নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল—এমন কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের

সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়া অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল* তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন !···

জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিন রাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল···কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে। তবু এই দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম।···জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।"

এই আলোড়ন-আঘাতের পরেই মেঘমুক্ত রবির বিস্ময়কর প্রকাশ। ওই ১২৯১ সালেরই চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'তে "বিদায়" ('কড়ি ও কোমলে' কবিতাটির নাম হয় "পুরাতন") কবিতায় কবির নিজের প্রশ্ন—

"উঠেছে প্রভাত রবি,
আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়,
তারে ত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!"

ধীরে ধীরে নিজের মনেই মিলাইয়া যায়। কবি ঘোষণা করেন—

"আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।··· শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে।··· জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে।······

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।

---

* 'বলাকা' কাব্যের "তুমি কি কেবল ছবি" কবিতা দ্রষ্টব্য। এই কবিতার লক্ষ্য কে সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

"বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন" দুঃসহ মৃত্যুশোকের আঘাতেই আরব্ধ হইয়া যায়।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কিছুকাল পূর্বেই হইয়াছিল। কিন্তু প্রবাহ একটা দুরন্ত ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়া যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল প্রিয়জনবিরহের এই বেদনা-আলোড়ন সাময়িক স্তম্ভিত ভাব কাটাইয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া সাগরমুখী করিল; "নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।" ১২৯১ হইতে ১৩০০ সাল, এই নয় বৎসরে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র স্ফুরণ বিস্ময়কর। কবি যেন সহসা আপনাকে আবিষ্কার করিলেন। যাহা একান্ত নিজের কথা ছিল তাহাই সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় সকলের কথা হইয়া উঠিল। কাব্যে, গানে, ছোটগল্পে, চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধে, হেঁয়ালিনাট্যে, ব্যঙ্গ-হাসি-কৌতুকে, নাটকে, প্রহসনে, উপন্যাসে এমন কি বক্তৃতায় ও বিতর্কে রবীন্দ্র-প্রবাহ কল ছাপাইয়া উদ্বেল হইয়া উঠিল। এই নয় বৎসর কালের মধ্যেই 'ভারতী', 'বালক', 'হিতবাদী' ও 'সাধনা'য় "রবির পূর্ণ উদয়ে"র সকল লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

১৩০০ বঙ্গাব্দের প্রায় সমাপ্তি মুখে ছাব্বিশে চৈত্রের সায়াহ্নে বঙ্গসাহিত্যাকাশ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব ঘটিল, এবং ঠিক এক মাস ১৫ দিন পরে ১৩০১, ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। বাংলা-সাহিত্য-সাধনায় এই দুই জনই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয়—সাহিত্যগুরু ও "কাব্যগুরু"। এই দুই জনের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্য-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার একা রবীন্দ্রনাথে বর্তাইল। এগার বৎসর পরে দ্বিজ-রাজ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিল—"রবির পূর্ণ উদয়" ঘটিল।

উত্তরাধিকারসূত্রে উভয়ের শ্রাদ্ধ যথোচিত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত একা রবীন্দ্রনাথ সম্পন্ন করিলেন। ১৩০১ বৈশাখের গোড়ায় চৈতন্য লাইব্রেরির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শোকসভায় সুবিখ্যাত "বঙ্কিমচন্দ্র" ('আধুনিক সাহিত্য' প্রথম প্রবন্ধ) পাঠ এবং আষাঢ়ের 'সাধনা'য় সুপরিচিত "বিহারীলাল" ('আধুনিক সাহিত্য' দ্বিতীয় প্রবন্ধ) প্রকাশের দ্বারা তিনি উত্তরাধিকার কায়েম করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিলেন:

"বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি,...কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।... বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

"বিহারীলাল" প্রবন্ধে লিখিলেন :

"বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না...কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সঙ্গীত-কাকলীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।...'বঙ্গদর্শন'কে যদি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন [বিহারীলালের] 'অবোধ বন্ধু'কে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে। সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"

রবীন্দ্রনাথে এই দুই শক্তি—বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলাল—একাধারে একত্র সংহত হইয়াছে। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গ-সাহিত্যকে যেমন বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' তেমনই তাহাকে পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিল। আধুনিক বঙ্গ-কাব্যসাহিত্যের প্রত্যূষে বিহারীলাল নিজের অস্ফুট ভাষায় কাকলী তুলিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ দিনের প্রহরে প্রহরে স্বকীয় প্রদীপ্ত কণ্ঠে ছয়রাগ ছত্রিশরাগিণীর লহর তুলিয়া বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত করিয়া দিলেন। যে 'সোনার কাঠি'র আভাসমাত্র বিহারীলালে দেখা গিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে তাহারই জাগ্রত "স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ" করিয়াছে।

অর্থাৎ "রবির পূর্ণ উদয়" ঘটিল। ইতিপূর্বে 'মানসী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'সোনার তরী' প্রকাশিত হইয়াছে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, "সাহিত্য-সেবক" নিত্যকৃষ্ণ বসু, বন্ধু প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি এই সকল কাব্য লইয়া

তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি সর্বপ্রথম দেখিতে পাই সেকালে বাংলাসাহিত্যের দিক্‌পাল চন্দ্রনাথ বসুর একটি পত্রে। সামাজিক আচার-বিচার-ব্যবহার লইয়া তাঁহার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিরোধ সর্বজনবিদিত। তৎসত্ত্বেও এই বৃদ্ধ সাহিত্যিক অনুজ রবীন্দ্রনাথকে যে স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন তাহাকে বাংলাসাহিত্যে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। ১৩০২ ফাল্গুনে 'চিত্রা' বাহির হইয়াছে। 'কণিকা' বাহির হইল ৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬ এবং তাহার পর, পরে পরে 'কথা',—১লা মাঘ ১৩০৬, 'কাহিনী'—২৪ ফাল্গুন ১৩০৬, 'কল্পনা'—২৩ বৈশাখ ১৩০৭ এবং 'ক্ষণিকা'—শ্রাবণ, ১৩০৭ বাহির হইলে প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু সেগুলি পাঠ করিয়া কতখানি বিস্ময়বিমুগ্ধ হইলেন নিম্নলিখিত পত্রখানি তাহার সাক্ষ্য হইয়া আছে। পত্রটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি:

কলিকাতা

৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।

৩০এ শ্রাবণ, ১৩০৭

রবীন্দ্রনাথ

তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই—তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। 'কণিকা', 'কথা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'—বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা—পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। 'কণিকা' ছাড়িতে না ছাড়িতে 'কথা' আসিল—'কথা' দিয়া তুমি আমার হইতে 'কণিকা' কাড়িয়া লইলে—'কণিকা'র ভোগ ত আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া 'কল্পনা' দিয়া 'কথা' কাড়িয়া লইয়াছিলে আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে! এবার 'ক্ষণিকা'য় চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র—সুতরাং আমার গতি বড় ধীর—আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি—কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি—ও গতি যথার্থই বিদ্যুতের গতি,—যেমন দ্রুত, তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি সুন্দর। ও গতি এখানকার নয়, ঊর্দ্ধদেশের—মহাকাশের। রবীন্দ্রনাথ, তোমার পরিমাণ করিতে পারি, যথার্থই এমন শক্তি আমার নাই।

ইতি

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু

এই অপূর্ব উদার প্রশস্তি উনবিংশ শতকের শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট তারিখের ঘটনা। পুরাতন শতাব্দী সমাপ্ত হইবার ঠিক চার মাস পূর্বে অর্থাৎ ওই ১৯০০ সনেরই ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গের আর এক মনীষী সন্তান, রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিশ্বভাষায় অর্থাৎ ইংরেজীতে সর্বপ্রথম বাংলার কবিকে বিশ্বকবি বলিয়া সম্বর্ধিত করেন। উপাধ্যায়-সম্পাদিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য ইংরেজী সাপ্তাহিক *Sophia*র ১লা সেপ্টেম্বর ১৯০০ সংখ্যায় "The World-Poet of Bengal" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

> Rabindra Nath is the youngest son of the Brahma patriarch, Devendranath Thakur. He is about forty years old, but he looks as youthful as a fresh-blown *champa.* His raven locks, lotus-petalled eyes, pencilled eyebrows, chiselled nose, swan-like neck, and the majesty of his tall figure illumined by a marigold complexion, would make a subject worthy of the canvas of a Raphæl or an Angelo.
>
> But his poetry is greater, better and immeasurably higher than his person. In his youth he warbled, like a sweet little birdie, strains of love inspired by the sensuous beauty of nature. He soared with the dewy lark to bathe in the flood-light of the morning sun ; he flew with the *chatak* to drink of the rainclouds ; he revelled with the *chakor* in the moonbeam overflowing the earth with molten silver. He wandered in bowers of roses resonant with the pipings of feathery songsters ; played with the shiny shingles of the brook and gazed and gazed at the eddying rainbows formed in its bosom by the golden darts of the sun. In fact there was no beauty in nature which he did not woo and win over to his youthful self.
>
> But in all his revellings on rose-banks and wallowings in beds of lilies there is a spirit of sadness which restrains the extravagance of joy, chastens the coarseness of the senses, and stands as a shade

obscuring, yet beautifying, the exuberance of light which in-forms his passionate lyrics. He sings; his voice pierces the mid-sky and smites the very vault of heaven, but falls down, at last, on the earth like a shower of bewailing, tremulous tear-drops. His song is more like the cooing of a dove pouring out its heart to one that is absent than the self-sufficient strain of the cuckoo filling the woodlands with its luxurious richness.

This sadness about him has made him a master in the art of portraying human passions. Who has read his description of a *sannyasi's* struggle ['প্রকৃতির প্রতিশোধ'] to put out the flame of paternal affection towards an orphan girl, and not shed hot tears? Who is there so hardhearted as not to melt in pity at the sight of his picture of a burly *Cabuli* fruit-seller ["কাবুলিওয়ালা"] transformed into tenderness itself by the majestic charms of the blossom of a Bengali girl? And one would not mind to be disengaged from Tennyson's "In Memoriam" and Shelly's "Epipsychidion" to sympathise and grieve with him in his outbursts of pain—the excruciating pain of an unrequited love.

Rabindra is not only a poet of nature and love but he is a witness to the unseen. Revelation apart, Kant, Tennyson and Newman are considered to be three modern witnesses to the invisible world. Poor Bengal has produced another and it is Rabindra Nath.

When we were young, full of ardour love and warmth, we were one day reading his "World-Current," ["স্রোত"—'প্রভাত সঙ্গীত'*] We were carried

---

* কবিতাটির শেষাংশ এই :—

"জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই

on and on by the "current" till we felt ourselves lost in a shoreless ocean of beauty and love. Tedious time with its painful divisions appeared to us but a speck, in the colorless bosom of eternity. Our individuality lost its isolatedness and was joined to the all. We could not live apart. We were obliged to live as a part of the whole. We were made partakers of the symphonies of the spheres. We hovered from flower to flower with the honey-sipping bee. We sang with the happy and wept with the sorrowing. We drank of the mother's heart and ran after children in love. We realised that we were living with all but not with ourself. And this "World-Current" is but a small poem written at random. Whenever he sings, whether it be of beauty that pervades the world, or of love that makes man semidivine, he takes us to the region of the infinite. The heavens with their luminous orbs, the earth with its flora and fauna, man with his reason and love, have been transformed by his magic wand into ripples of an eternal beauty that lies outstretched beyond space, unruffled and serene. He is verily a mystic beholder of the invisible regions.

If ever the Bengali language is studied by foreigners it will be for the sake of Rabindra. He is a

---

তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি!
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই।
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই।
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।"

world-poet. He is like the Devadaru which has its roots deep down, down the lowlands but which threatens to pierce the sky—such is its loftiness. He will be ranked amongst those seers who have come to know the essence of beauty through pain and anguish.

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘের মাঝে অস্তাচলে গিয়া বাংলার রবিকে মধ্যাহ্ন-দীপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। নূতন শতাব্দীর প্রথম বৎসরের মাঝামাঝি জুন-জুলাই ১৯০১, 'নৈবেদ্যে'র প্রকাশ বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাকে আর এক ধাপ অগ্রসর করিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তৎসম্পাদিত *The Twentieth Century* মাসিক পত্রের ৩১ জুলাইয়ের সংখ্যায় নরহরি দাস ছদ্মনামে 'নৈবেদ্যে'র এক দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক পরিচয় লিখিয়া বাঙালী কবিকে ভারতের অন্যত্র এবং বিদেশে পরিচিত করিলেন। তিনি লিখিলেন :

"*Naivedya* is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace."

বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নির্মম উক্তি সম্পূর্ণ ফলিতে বিলম্ব হইল না। ঠিক এক বৎসর তিন মাস ২৩ দিন পরে ১৯০২ সনের ২৩ নবেম্বর ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ তারিখে রবিমণ্ডলের নিকটতম স্নেহঘন ছায়াটি অপসারিত হইল। প্রচণ্ড দীপ্তিতে বিশ্বভুবন পরিপ্লাবিত করিবার জন্য মধ্যাহ্ন গগন হইতে প্রতীচীর পথে নিঃসঙ্গ রবির জয়যাত্রা আরম্ভ হইল।

রবি-রশ্মি

রবির প্রতিপত্তি তার আলোক-রশ্মিতে, এই রশ্মি না থাকিলে রবি কাহারও দৃষ্টিগোচরই হইত না। কবির ক্ষেত্রে তাঁহার কবি-কর্মই এই রশ্মিজাল। রবির স্থষ্টির মধ্যে কবিত্ব, সাহিত্য ও সাহিত্যধর্ম বিষয়ক এমন অনেক উক্তি আছে যাহা তাঁহার সাহিত্যের সম্যক্ উপলব্ধির সহায়ক। "রবি-রশ্মি" অধ্যায়ে সেইগুলি আমার বুদ্ধিবিবেচনামত বাছাই করিয়া প্রকাশ করিতেছি। সুখের বিষয় রবীন্দ্র-তিরোভাবের কিছু পরেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বর্তমান শতাব্দীর সূত্রপাত হইতে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্লেষণমূলক রচনাগুলি একত্র করিয়া 'আত্মপরিচয়' নামে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে প্রথম নিবন্ধ ১৯০৪ সনে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে লিখিত আত্ম-পরিচয় এবং পঞ্চম নিবন্ধ ১৯৩১ সনের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তীউৎসবে ছাত্রদের সম্বর্ধনার প্রতিভাষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গূঢ় কাব্যজীবনে এই দুই রশ্মি যে আলোকপাত করিয়াছে তাহাতে তাঁহার কাব্যগহনে প্রবেশের পক্ষে এই দুটিকে দিগ্‌দর্শক বলিতে পারি। এই গ্রন্থের "ভূমিকা"য় এই দুইটি নিবন্ধের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যক্তিগতভাবে কাব্য স্থষ্টি করিতেছেন ইহা কখনই মনে করেন নাই। কোনও কৌতুকময় কবিসত্তা তাঁহার অন্তরমাঝে বসিয়া অহরহ তাঁহাকে দিয়া কথা কহাইয়া চলিয়াছেন সেই বিশ্বাস বাল্যকাল অবধি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার ছিল। ১৯০৪ সনে আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া

প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেই জন্য এতবড়ো-রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।"

পরবর্তী শতাব্দীপাদের কাব্যসাধনায় কবির ধারণা সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্টতর হইয়াছে। প্রতিভাষণে বলিতেছেন :

"ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগল সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর গভীর উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর। কলা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের অনুরাগের সম্পদ রচিত ও সঞ্চিত হয়ে উঠছে। এই বিশাল ভুবনে বিশেষ দেশের মানুষ বিশেষ কাকে ভালোবেসেছে সে তার সাহিত্য দেখলেই বুঝতে পারি। এই ভালোবাসার দ্বারাই তো মানুষকে বিচার করা।

বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলি নে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।"

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই কার্তিক তারিখে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ঠিক প্রাক্কালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে কবি লিখিয়াছিলেন :

"কবির কাজটি বিনা সহায়ের কাজ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইনস্টিটিউশন ভাঙে গড়ে এবং পরিবর্তিত হয় কিন্তু গান [সাহিত্য] জিনিষটি

কালতরঙ্গের উত্থানের পতনের আঘাতে ডোবে না, তার উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। সৃষ্টি-কার্য্যের সেই চিরকালীন ভাসান-খেলায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল।”

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে সীমা-অসীমের দ্বন্দ্ব লইয়া তখন বিতর্ক চলিতেছিল। উপরে উল্লিখিত পত্রেই কবি স্বয়ং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা সেই বিতর্কের অবসান ঘটান। রবীন্দ্রনাথকে সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য এই অমূল্য চাবিকাঠিটির প্রয়োজন ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

“বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে। আমার রচনায় সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব নাই, মিলন আছে; তাহার কারণটি কেবলমাত্র আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতিতে নাই, আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিয়া [এডওয়ার্ড টমসন তাঁহার রবীন্দ্র-সম্পর্কিত প্রথম গ্রন্থে কবিকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছিলেন।] ইহা বুঝা যায় না। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও উপনিষদের এই সঙ্গম ঘটিয়াছিল—সৃষ্টির পক্ষে এইরূপ দুই বিষমের মিলনের প্রয়োজন আছে—সৃষ্টিকর্ত্তার চিত্তের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আছেন নহিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না।”

যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্য-সাগরে অবগাহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছেন তাঁহার মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুই সত্তাই কাজ করিয়াছে এবং শুধু কাজ করা নয়—এই দুইয়ের আশ্চর্য সামঞ্জস্য তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। এই পত্রের ঠিক সাতাশ বৎসর পূর্বে বিহারীলাল সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি আরও স্পষ্টতর ভাবে বলিয়াছিলেন—

“আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন দেশ ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুল ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, আর একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি। এই

বনের পাখিটাই বেশি গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু ইহার গানের মধ্যে অসীম স্বাধীনতার জন্ত একটি ব্যাকুলতা, একটি অভ্রভেদী ক্রন্দন বিবিধ ভাবে এবং বিচিত্র রাগিণীতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

স্ত্রী ও পুরুষ, সীমা ও অসীম রবীন্দ্র-সাহিত্যে পার্বতী-পরমেশ্বরের মত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া আছে।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাতে কবি রবীন্দ্রনাথের এতাবৎকাল কৃত কবিকর্মের যে পরিচয় আছে রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝিবার পক্ষে তাহা সবিশেষ মূল্যবান। এই ভাষণটি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের চতুর্থ নিবন্ধ। ইহার প্রথমাংশে বিধৃত কবি-পরিচয় এইরূপ :

"নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, সত্তর বৎসরে পৌঁছবার অবকাশ না দিতেন, তাহলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাজনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইনে হতে নববঙ্গে নবযুগের চালক'। সে-কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখি

নে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুল-পাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে-বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে, সুখদুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।"

আরও সাড়ে পাঁচ বৎসর পরে ১৩৪৩ সনের ৮ই আশ্বিনে লিখিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের ভূমিকা-পত্রে তিনি বিজ্ঞানীর কাজ ও কবির কাজের পার্থক্য দেখাইয়া সাহিত্যের কাজের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন এইভাবে :

"বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য; তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমন-কি, সেই অদ্ভুতের, সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে নেবে। মানুষ শিশুকাল থেকেই নানা ভাবে আপন উপলব্ধির ক্ষুধায় ক্ষুধিত, রূপকথার উদ্ভব তারই থেকে। কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানা খানা—রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমত হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ। সে লীলায় সুন্দরও আছে অসুন্দরও আছে।"

সামান্যের সঙ্গে বিশেষ, চিরন্তনের সঙ্গে সাময়িক সাহিত্য-সমস্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথ উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার জীবনের শেষ দশকে সাহিত্য-ব্যাপারে রুচি ও গতিপরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন তাহাও সর্বদা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

"আধুনিক এই ত্বরা-তাড়িত যুগে প্রয়োজনের তাগিদ কচুরিপানার মতোই সাহিত্য-ধারার মধ্যেও ভূরি ভূরি ঢুকে পড়েছে। তারা বাস করতে আসে না। সমস্যাসমাধানের দরখাস্ত হাতে ধন্না দিয়ে পড়ে। সে দরখাস্ত যতই অলংকৃত হ'ক তবু সে খাঁটি সাহিত্য নয়, সে দরখাস্তই। দাবি মিটলেই তার অন্তর্ধান।

এমন অবস্থায় সাহিত্যের হাওয়া বদল হয় এ-বেলা ও-বেলা। কোথাও আপন দরদ রেখে যায় না। পিছনটাকে লাথি মেরেই চলে যাকে উঁচু করে গড়েছিল তাকে ধূলিসাৎ করে তার প'রে অট্টহাসি।···হৃদয়হীন অগভীর বিলাসের আয়োজনে অকারণে অনায়াসে ঘন ঘন ফ্যাশনের বদল। এখনকার সাহিত্যে তেমন রীতির বদল। হৃদয়টা দৌড়তে দৌড়তে প্রীতি সম্বন্ধের রাখি গাঁথতে ও পরাতে পারে না। যদি সময় পেত সুন্দর করে বিনিয়ে বিনিয়ে গাঁথত। এখন ওকে ব্যস্ত লোকেরা ধমক দিয়ে বলে, রেখে দাও তোমার সুন্দর। সুন্দর পুরনো, সুন্দর সেকেলে। আনো একটা যেমন তেমন করে পাক দেওয়া শণের দড়ি—সেটাকে বলব রিয়ালিজম্। এখনকার দুদ্দাড় দৌড়ওয়ালা লোকের ঐটেই পছন্দ। স্বল্পায়ু ফ্যাশন হঠাৎ-নবাবের মত উদ্ধত—তার প্রধান অহংকার এই যে, সে অধুনাতন, অর্থাৎ তার বড়াই গুণ নিয়ে নয় কাল নিয়ে।

বেগের এই মোটর কলটা পশ্চিম দেশের মর্মস্থানে। ওটা এখনো পাকা দলিলে আমাদের নিজস্ব হয় নি। তবু আমাদেরও দৌড় আরম্ভ হল। ওদেরই হাওয়া-গাড়ির পায়দানের উপর লাফ দিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। আমরাও খর্বকেশিনী খর্ববেশিনী সাহিত্যকীর্তির টেকনিকের হাল ফ্যাশন নিয়ে গম্ভীর ভাবে আলোচনা করি, আমরাও অধুনাতনের স্পর্ধা নিয়ে পুরাতনের মানহানি করতে অত্যন্ত খুশি হই।···দূরকাল ও বহুজনকে যে সম্পদ দান করার দ্বারা সাহিত্য স্থায়িভাবে সার্থক হয়, কাগজের নৌকোয় বা মাটির গামলায় তো তার বোঝাই সইবে না। আধুনিক-কাল-বিলাসীরা অবজ্ঞার সঙ্গে বলতে পারেন এসব কথা আধুনিক কালের বুলির সঙ্গে মিলছে না—তা যদি হয় তা হলে সেই আধুনিক কালটারই জন্যে পরিতাপ করতে হবে। আশ্বাসের কথা এই যে, সে চিরকালই আধুনিক থাকবে এত আয়ু তার নয়।

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। চিরপরিচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের রস পৌঁছচ্ছে না। তাই জগৎটাকে আপনার মধ্যে নিতে পারল না। যে কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি

রয়েছে চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।…আমি জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্ত কালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম।"

চিরন্তন, শাশ্বতের প্রতি ব্যাধিজনিত এই অরুচি যে নিত্যকালের বস্তু নয় রবি-রশ্মি আমাদের বারংবার সেই আশ্বাস দিয়াছে। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রায় সত্তর বৎসরের সাহিত্যসাধনায় লব্ধ পরমজ্ঞান তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন—

"সকল উপলব্ধিরই নির্বিচারে এক মূল্য নয়। আনন্দ সম্ভোগে মানুষের নির্বাচনের কর্তব্য তো আছে। মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দসম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনও কখনও অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশি। তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়, মানুষের চিরকালের স্বভাব ফিরে আসে, আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।"

সাহিত্যশিল্পী এবং সাহিত্যস্রষ্টাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের মহৎ ও শাশ্বত সত্য মাত্র বত্রিশটি শব্দে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে বাণী স্মরণে রাখিলে অসংখ্য বিভ্রান্তির মধ্যেও আমরা দিগভ্রান্ত হইব না। নিবিড়তম তমিস্রায় আমাদিগকে পথ দেখাইবার জন্য সেই রবিরশ্মিটির রূপ এই—

"মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত ; সেইখানেই তার সত্য প্রকাশ।"

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহুমুখী প্রকাশ

দীর্ঘ আশি বৎসরের জীবন ও প্রায় ত্রিপাদশতাব্দীর সাহিত্য লইয়া রবীন্দ্রনাথ এমনই বৃহৎ এবং বিপুল যে তাঁহাকে পরিচিত করিবার ও তাঁহার সাহিত্যকে উপলব্ধি করাইবার প্রয়াস ঠিক বিরাশি বৎসর তিন মাস পূর্বে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত শেষ তো হয়ই নাই, প্রতিদিন উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। যতদূর জানা যায় ১৮৭৮ সনের ৫ নবেম্বর রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ, 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হইবার চার মাসের মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত 'বান্ধবে' ১২৮৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৯) স্বয়ং সম্পাদক-কর্তৃক কিশোরকবি অভিনন্দিত হন এবং তাঁহার সদ্য-প্রকাশিত কাব্য "বাঙ্গালা ভাষার নূতন একখানি আভরণ"রূপে স্বীকৃত হয়। তাহার পর বর্ষাগমে গিরিনদীতে যেমন বন্যা নামিয়া আসে রবীন্দ্র-সাহিত্যখাতে তেমনি প্রশংসা (৮০%) ও নিন্দার (২০%) বান ডাকিয়া যায়। বিরাশি বৎসরের সেই পুরাতন বন্যাধারা আজিও অব্যাহত আছে। বহু লেখক নিজ নিজ মর্জিমত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, পাঠকেরাও মর্জিমত তাহা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। বাংলা-ইংরেজী ও পৃথিবীর অন্য ভাষায় এইরূপ সমালোচকদের সংখ্যা অসংখ্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম সাহিত্যসম্মত সুষ্ঠু আলোচনার জন্য অজিতকুমার চক্রবর্তীকে সকলে সম্মান করিয়া থাকেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা, চিঠিপত্র এবং রচনাসমূহের প্রকাশকাল-প্রভৃতি তন্নতন্ন বিচারের দ্বারা সুবৃহৎ চার খণ্ডে 'রবীন্দ্র-জীবনী' নামে যে দিনপঞ্জী-রচনাপঞ্জী-ও-রবীন্দ্রসাহিত্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সন-তারিখ-তথ্য-তত্ত্বের কিছু কিছু ভুল সত্ত্বেও রবীন্দ্র-রসিকেরা সেটির ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই বইটিকে ভিত্তি করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলে রবীন্দ্রনাথকে বুঝা বরঞ্চ সহজতর হইবে, হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী সুবিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্লেষণমূলক বহু গ্রন্থে সরলমনা পাঠকের বিপদ আছে। কবি নিজে বহু প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, আলাপ-আলোচনায়, চিঠিপত্রে, গ্রন্থ-ভূমিকায়, এমন কি কবিতায় তাঁহার কাব্য ঠিক মত বুঝিবার সহস্র ইঙ্গিত সর্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছেন। একটু যত্ন করিয়া সেগুলি আহরণ করিতে

পারিলে রবীন্দ্র-কাব্যকেও আয়ত্তের মধ্যে আনা কঠিন হয় না। কবির সহিত ব্যক্তিগত আলাপ ও পত্রালাপে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-কবিতা-মর্ম-উদ্ঘাটন-সহায়ক অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একাধিক গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'সঞ্চয়িতা'র কবিতার মোহিত-লাল মজুমদার-কৃত ধারাবাহিক ব্যাখ্যাও বিশেষ মূল্যবান। রবীন্দ্র-সাহিত্যগহনে সবচাইতে নিরাপদ গাইড হইতেছে খোদ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী। বিনা সহায়ে বারবার পাঠ করিলে মর্ম মোটামুটি উদ্ঘাটিত হয়, ভুল পথে পরিচালিত হইবার ভয় থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমি বহুমুখী রবীন্দ্রসাহিত্যের দুই একটি দিক লইয়া মাঝে মাঝে যে ভাষণ দিয়াছি তাহা এই অধ্যায়ে একত্র সংকলন করিয়া দিলাম। আমার একমাত্র কৈফিয়ত—অধিকন্তু ন দোষায়।

রবীন্দ্রনাথের মন

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দাবি করেন, রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্লেষণ করবার অধিকার তাঁদেরই। সে অধিকারের দাবি আমি করি না। আমি তাঁর সংস্পর্শে কমই এসেছি এবং যতটুকুই এসেছি, তার মধ্যে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর নিরাবরণ মনখানি দেখে ফেলবার সৌভাগ্য আমি লাভ করি নি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্লেষণ করার এই অক্ষম চেষ্টাকে অনেকে আমার অনধিকারচর্চা বলবেন, এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ের দিক থেকে বিচার হলে সে ত্রুটি আমি স্বীকার করব।

কিন্তু আমার একটা মস্ত ভরসা এই যে, অত্যন্ত সাবধানী রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে ডুব দিয়ে সেই অতলের সম্পূর্ণ সন্ধান আজও কেউ পান নি, পাওয়া অসম্ভব। ডুমুরের ফুলের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করে, গভীর অমাবস্যা রাত্রে তারার আলোতে তা দেখবার মিথ্যা প্রয়াস তারা করে শুনেছি। রবীন্দ্রনাথের মন সেই ডুমুরের ফুল। আমরা চোখে সে ফুল দেখি না বটে, কিন্তু ফলের প্রকাশে তার অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ পাই। রবীন্দ্র-মহীরুহ পুষ্পস্তবকভারে আনমিত নয়, কিন্তু ফলভারে তার শাখাপ্রশাখা আমাদের চিত্তভূমি নিরন্তর স্পর্শ করছে; তাঁর অসংখ্য রচনাফল অর্ধশতাব্দী ধরে আস্বাদন করে তাঁর সহস্র সহস্র ভক্ত সহস্র প্রকার মনের স্পর্শ পেয়েছেন এবং তাতে যে রসসংবেদনা

তাঁদের মনে জাগ্রত হয়েছে, তার পরিচয় তাঁরা লেখনীমুখে দিয়ে গেছেন। ফল থেকে ফুলের অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মনের যে স্বরূপ তাঁরা কল্পনা করেছেন, তা এমন পরস্পরবিরোধী এবং বিচিত্র যে, অন্ধের হস্তীদর্শন-ন্যায় অনুযায়ী সবগুলোকে মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ বস্তু খাড়া করতে গেলে উপনিষদের ব্রহ্ম-বর্ণনারই মত তা ইতি এবং নেতিবাচক একটা অপূর্ব বস্তু হয়ে উঠবে। ভক্ত একলব্যের মত আমিও দূরে থেকে একান্তে গুরুর এক ধ্যানরূপ কল্পনা করেছি তাঁরই রচনাধারার সহস্র প্রকাশ থেকে; খণ্ড খণ্ড পরিচয়ে হয়তো তাঁকে সম্পূর্ণ দেখা হয় নি, কিন্তু যতটুকুই দেখেছি, ততটুকুই যে সত্য, সে বিষয়ে আমার সংশয় নেই; কারণ আমার সেই খণ্ডপরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে প্রাপ্ত—আমার মনগড়া কিছু নয়। সেই পরিচয়টুকু পারতপক্ষে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় দেবার চেষ্টা করব। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কালিদাসের মত কবির পক্ষে কুড়ি মিনিটে হিমালয়বর্ণন অসম্ভব না হলেও কুড়ি মিনিটে রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণ করার মত আজগুবি কাণ্ড আর কিছু হতে পারে না। পাঠকদের আসরে আজগুবি কথা বলার অধিকার লেখকদের আছে বলেই এই ভরসা করছি।

সন্ধ্যায় "তারকার আত্মহত্যা"র পর প্রভাতে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হবার আগে অধীর আবেগে কবি মনের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। জগৎ ও জীবনের রহস্য তাঁর চিত্তে জাগাচ্ছে অসীম কৌতূহল। যে অভাবনীয় লুকিয়ে আছেন আমাদের চারদিকে, ঠিকমত হাত বাড়াতে পারলে কখন্ যে তাঁকে ধরা যাবে, মিলবে তাঁর ঠিকানা, এই হল জাগ্রত মনের ভাবনা। রহস্যময়ী প্রকৃতি তাঁর মুঠোর মধ্যে অধরাকে আর অজানাকে গোপন রেখে অনন্ত কৌতুকভরে বালকের মুখের পানে চেয়ে আছেন। মাটির আঁধারে পুঁতে দেওয়া বিচি থেকে আলোর আকাশে জন্মাবে গাছ, তারই অসহ্য বিস্ময় আর ঔৎসুক্য অস্বস্তির মত সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে। মনের ভাবটা এই—

"পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না···কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে, তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর একটা বাঁশ যদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁতা যায়, এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া গেলে পৃথিবীর খুব গভীরতম তলাটাকে হয় তো এক রকম করিয়া নাগাল পাওয়া যাইতে পারে।"

এই বেদনাময় ঐকান্তিক অনুভূতি থেকেই অকস্মাৎ একদিন জন্ম নিল প্রসন্ন নির্লিপ্ততা, সেই দিনই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র দিন—নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শুরু হল জগৎকে তার নিজের স্বরূপে দেখা। হঠাৎ

"একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।...এমনই হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।.. রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিলসমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।"

গোড়াকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এবং তার পরে অবারিত আলোক-বন্যা—কবি যেন নবজন্ম লাভ করলেন, কিন্তু এই রহস্যময় এবং প্রেমময় অনুভূতি একান্তভাবেই আর রইল না। এর পর কবিমনে শুরু হল আলো-অন্ধকারের সংঘাত, নীড় আর আকাশের দ্বন্দ্ব। 'মানসী'র প্রথম কবিতায় এই স্বপ্নভঙ্গ-যুগের একটা ইতিহাস আছে—

নিভৃত এ চিত্তমাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে
জগতের তরঙ্গ আঘাত,
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মুহূর্ত বিরাম নাই
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।

সুখদুঃখ গীতস্বর ফুটিতেছে নিরন্তর—
ধ্বনি শুধু, সাথে নাই ভাষা ;
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।
এ চির-জীবন তাই আর কিছু কাজ নাই
রচি' শুধু অসীমের সীমা ;
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে
গড়ে' তুলি মানসী-প্রতিমা।
বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে।
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র-গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা,
ছাড়ি' অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।

রবীন্দ্রনাথের মনের এই অবস্থা ছিল ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ বৈশাখ অর্থাৎ বারই মে তারিখে—উনত্রিশের কোঠায় তিনি সবে পা দিয়েছেন।

কিছুকাল পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে ভবিষ্যতের উপাদান সংগ্রহের জন্য আয়োজন চলছিল, ১২৮৮-৮৯ এই দুই বৎসর ছিল এই প্রস্তুতির কাল। ইণ্ডিয়ান গ্যাশনাল কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন এবং মৃদু তর্জন তার পর শুরু হয়েছে। অম্লপায়ী পোষ-মানা বাঙালীর, ভালমানুষ বাঙালীর 'বাঁধানো হুঁকা যতনে মাজা—মলিন তাস সজোরে ভাঁজা' জটলাবহুল জীবনের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন ; একান্ত প্রকৃতি পরিবেশের মধ্যে, বর্ষা-শরৎ-শীত-হেমন্তের একঘেয়েমির মধ্যে চিরন্তন অভাব এবং শাশ্বত ক্রন্দন সম্বল করে উর্ধ্বদৃষ্টি জীবনযাত্রা আশেপাশে দেখাটাও তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর মন তখন আশায় দুরন্ত—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন !
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন ;
বর্শা হাতে, ভরসা প্রাণে, সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।
বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে, শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্যালোতে
সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হতে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান যাহা সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝা মাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধুমাঝে লুটে।
নিমেষ-তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন-উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান,
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবনছায়ে,
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

বাংলা দেশের মেরুদণ্ডহীন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পা ফেলে চলতে রবীন্দ্রনাথের সবল এবং বিদ্রোহী মন আর চাইছিল না, তিনি ভিতরে ভিতরে পীড়িত হচ্ছিলেন ; কিন্তু চারিদিকে চেয়ে তিনি সেদিন যা দেখেছিলেন, তাতে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও বুঝেছিলেন, "এখনও সময় নয়।" "গুরুগোবিন্দে"র প্রার্থনায় এবং "ভৈরবী গানে" আমরা রবীন্দ্রনাথের তখনকার মনের কিছু আভাস পাই—

এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী
জাগিতে হইবে পল গণি' গণি'
অনিমেষ চোখে পূর্বগগনে
দেখিতে অরুণোদয়।

* * *

একা ফিরি তাই যমুনার তীরে,
দুর্গম গিরিমাঝে।
মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে,
মিশাতেছি গান নদী কলরোলে,
গড়িতেছি মন আপনার মনে,
যোগ্য হতেছি কাজে।

অথবা—

ওগো এর চেয়ে ভাল প্রখর দহন,
নিঠুর আঘাত চরণে।
যাব আজীবন কাল পাষাণকঠিন
সরণে।
যদি মৃত্যুর মাঝে নিয়ে যায় পথ,
সুখ আছে সেই মরণে।

এই মানসিক বৃশ্চিক-জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে করেছেন ছুটোছুটি—কলকাতা, বন্দোরা, সাহজাদপুর, শিলাইদা, সোলাপুর, পুণা, খিড়কি, দার্জিলিং, শান্তিনিকেতন, কিন্তু সর্বত্রই সেই এক দৃশ্য। সুতরাং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২২এ আগস্ট তারিখে স্বদেশের শান্ত এবং জলো আবহাওয়া ছেড়ে তিনি হঠাৎ পাড়ি দিলেম সমুদ্র পারে। তাঁর চঞ্চল অশান্ত মন, ঘরের কাদামাটি—রক্তমাংস হাসিকান্নার ঘনিষ্ঠ এবং ঘ্রাণত বাঁধনের মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠা মন বাহিরের কঠিন এবং বৃহত্তর পরিধির মধ্যে চেয়েছিল হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে। ভিতরে দ্বন্দ্ব তখন উদ্দাম, নিজের সঙ্গে নিজের চলছে বোঝাপড়া।

১০ই অক্টোবর লণ্ডন থেকে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—

"মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে। মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড কারখানা, তার এতদিকে গতি এবং এত রকমের অধিকার যে এদিকে ওদিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই তো আমাদের জীবনের গতিশক্তি—সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত ক'রে তুলছে। নদী যদি প্রতি পদে বলে,

কই সমুদ্র কোথায়—এ যে মরুভূমি—ঐ যে অরণ্য—ঐ যে বালির চড়া—আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে—তাহলে তার যে রকম ভ্রম হয় প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়। আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি—আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে—কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী-রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখানে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে—আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে, ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়—এই রকম করেই আমরা চলছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনীশক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হোতে পারে সাধু হোতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে—কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই।"

কিন্তু দেশের যে অভাব-অসঙ্গতির মধ্যে পীড়িত হয়ে মনের কশাঘাতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ বারো বৎসর পরে আবার লণ্ডনে পা দিয়েছিলেন, সেখানে গিয়েও দেখলেন, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীও সমান বিরক্তিকর, শান্তি সেখানেও মিলিল না এ যাত্রায়। তিনি লিখলেন—

"য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার ইতিহাস সাহিত্য পড়ে। সেটা হচ্ছে 'আইডিয়াল' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই।···এখন আমি বাড়ী যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই।"

রবীন্দ্রনাথ এক অদ্ভুত ঘরমুখো মন নিয়ে ১৮৯০ সনের ৩রা নভেম্বর তারিখে স্বদেশে ফিরে এলেন। সেদিন থেকে ১৯১২ সনের ২৪এ মে তারিখে 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ সঙ্গে নিয়ে আবার বিলাতযাত্রা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সাধনার যুগ—চেনা-বোঝা আপনার জনদের নিয়ে দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে স্বদেশের মধ্যে দেবতাকে মূর্ত দেখে 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন',

'ভাণ্ডার', 'প্রবাসী'র মধ্যে দেশের দুর্গত জনগণদের জন্যে আপনাকে উজাড় করে দিয়ে দীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল তিনি করলেন সাধনা। করলেন শিবাজী-উৎসব, বাঁধলেন রাখী, প্রতিষ্ঠা করলেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়। এই বাইশ বৎসরের কর্মতৎপরতার মধ্যেই তাঁর মন কিন্তু আশ্চর্য্য রকম মুক্তি পেয়েছিল—মৃত্তিকাস্পর্শহীনভাবে বিশ্বপ্রেমের আকাশলোকে মুক্তি নয়, মায়ের স্নেহবন্ধনের মধ্যে মুক্তি, জননী বঙ্গভূমির কোলে মুক্তি। এই যুগে রবীন্দ্রনাথের মনে কাব্য ও ছোটগল্পের যে বন্যাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের উষর ক্ষেত্র তাতেই হয়ে উঠেছে উর্বর, ফলফুল-শোভিত। আমরা এখন পর্যন্ত বিশ্বের দরবারে তারই গৌরব করছি। এই যুগের রবীন্দ্রনাথের মনের পরিচয় আমরা পাই তাঁর 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'য়—তাঁর ছোটগল্পে, তাঁর ব্যঙ্গনাট্যে এবং প্রহসনে, তাঁর স্বদেশী গানে। দেশকে গড়ে তোলবার ব্যাকুল আগ্রহ দেখতে পাই তাঁর 'ভারতবর্ষে', 'আত্মশক্তি'তে 'স্বদেশে', 'সমাজে', 'সমূহে', 'শিক্ষা'য় 'রাজাপ্রজা'য়। দেশ-মাতাকে সম্বোধন করে এই সময়েই তাঁর মন বলেছে—

এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা। তুমি শুধু মাগো,
নিদ্রিত শিয়রে তার নিশিদিন জাগো
মলয় বীজন করি। রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্য ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাট-শোভা সীমন্ত-রতন
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।

আবার অন্য দিকে তাঁর বিদ্রোহী মন আর্তনাদ করেছে—

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।

মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি।
শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

এই স্বদেশী যুগের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিল, যাতে তিনি দেশ থেকে দেশাতীতে হলেন উত্তীর্ণ, বাংলা মায়ের কোল ছেড়ে নিখিল-বিশ্বের স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় তিনি পেলেন আশ্রয়। তাঁর জীবন-দেবতা তাঁকে নিরুদ্দেশযাত্রার পথে বের করে দিলেন। 'নৈবেদ্যে' এর সূত্রপাত দেখি—

তীর সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান।
রশি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।

'খেয়া'য় দেখি—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলে গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিও না ভাই।

তারপর 'খেয়া', 'শিশু', 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে দিয়ে আমরা যখন 'উৎসর্গে' এসে পৌছুই, তখন

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ;
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।

এই মতবাদের সাক্ষাৎ পাই।

রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর মনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে অবিশ্বাস করবার কোনই কারণ নেই, কারণ তিনিই বলেছেন, "মনের যে দুর্গম গহনে তার আত্মবিস্মৃত বাণী ছায়াপথে বিচরণ করে, নিভৃত প্রকৃতির ডাক সেইখানে পৌছে তাকে উতলা করে বের করে আনে।"

দেশ থেকে দেশাতীতে, দেহ থেকে দেহাতীতে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনই বিস্ময়কর।

রবীন্দ্র-রূপক-নাট্য

মানুষের ভাষা তার মনের অনুভূতি ও ভাব-প্রকাশের একটা চেষ্টার ফলে গড়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ বস্তুজাত অনুভূতি বা বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ভাষার ইঙ্গিতকে ভাবের বাহন করা তার পক্ষে সহজ। কিন্তু এমন সব জটিল-গহন-গূঢ়-অনুভূতি ক্রমে ক্রমে তার মনে জাগতে থাকে সরাসরি ভাষার ইঙ্গিত দিয়ে যাকে প্রকাশ করা যায় না। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একজন স্রষ্টা কল্পনা করে তাঁর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে সেই সম্পর্ক প্রচারে মানুষের ভাষা বারবার বিফল হয়েছে, আজও পর্যন্ত বিফল হচ্ছে। অজানাকে অজ্ঞেয়কে জ্ঞানের পরিধি দিয়ে ধরতে পারছে না মানুষ, কেবল আঁকুপাঁকু করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাস অস্পষ্ট ইঙ্গিতের পর্যায়েই রয়ে গেছে, কোথাও এখন পর্যন্ত স্পষ্ট রূপ নিতে পারে নি ভাষাগত বর্ণনায়। ঈশ্বর-সামীপ্য-সাযুজ্যের ক্ষেত্রে যাঁরা অধিকতর অগ্রসর, জটিল দার্শনিক চিন্তায় যাঁরা চরমোৎকর্ষ লাভ করেছেন, এক কথায় যাঁরা চরম আধ্যাত্মিক অথবা পরম দার্শনিক, তাঁরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশে যথাক্রমে আপাতঅর্থহীন বীজমন্ত্রের এবং নেতিবাচক

বিশেষণের প্রয়োগ করছেন। যাঁরা অবতারকল্প পুরুষ অর্থাৎ সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক দিগ্দর্শক যাঁরা, তাঁরা প্রয়োগ করেন উপমার, প্যারাব্‌লের, রূপকের; জানা কথা, জানা গল্প, সরল উপমার মধ্যে দিয়ে দুরূহ, দুস্তর্ক্য, অচিন্ত্য, দুজ্ঞেয়কে তাঁরা মানুষের সহজ অনুভূতিগোচর করে তুলতে পারেন। নিজের সাধনালব্ধ কঠিন জ্ঞানকে তাঁরা সরল করে পাঁচজনের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

কিন্তু এই প্রকাশ-ব্যাপারে সবচাইতে সৌভাগ্যবান হচ্ছেন কবিরা; যাঁরা সত্যকার কবি তাঁরা ঋষিপদবাচ্য। অজ্ঞাত শক্তি তাঁদের ওপর ভর করেন, তাঁদের বাণী হয় চিৎশক্তিসম্পন্ন। সম্পূর্ণ অ-গতানুগতিক পদ্ধতিতে নিজস্ব মনোহারী ভঙ্গিতে ও সবজনবোধ্য ভাষার ইঙ্গিতে তাঁরা অবাঙ্‌মনস-গোচরকে ধরে ফেলেন, তাঁরাই বলতে পারেন

"রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি"

অথবা

"প্রকাশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা।"

বাস্তবিক তাঁরা রূপের মধ্যে অরূপরতনকে ধরতে পারেন, অপ্রকাশকে প্রকাশ করেন দৈহিক অনুভূতির সাহায্যে। সহজবোধ্য ভাষায় রচিত তাঁদের সঙ্গীত হয়ে ওঠে অজানাকে জানার ইঙ্গিত, বিশ্বরঙ্গমঞ্চের অন্তরালবর্তী নাট্যকারকে—অরূপকে তাঁরা প্রকাশ্যে মঞ্চাসিত করেন রূপক নাটকে। ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের আসল মর্মকথা হচ্ছে এই।

রবীন্দ্রনাথ অন্য নাটকও লিখেছেন যার কাহিনী-অংশ প্রধান—যাতে গল্প তত্ত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। রূপক নাটক যেগুলিকে বলছি সেগুলিতে গল্প বা কাহিনীকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছে তত্ত্ব, রূপ দিয়ে রূপাতীতকে ধরবার চেষ্টা যার মধ্যে প্রকট, কথার বাঁধনে মুক্তির সাধন যার লক্ষ্য। বিচ্ছিন্ন ভাবে এর সূত্রপাত দেখি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কবির বয়স যখন মাত্র তেইশ—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাট্যকাব্যে। সাধারণ কাহিনীমূলক নাটক রচনার প্রয়াস এটি নয়, এটি অসাধারণেরই সূচনা। কবি স্বয়ং তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া, একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের

মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই, তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই।···আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিতে হইয়াছে।"

এর পরেই দীর্ঘ চব্বিশ বছর পার হয়ে আমাদের আসতে হবে ১৯০৮ সনে, যেখান থেকে ১৯৩২ সন পর্যন্ত আরো চব্বিশ বছর কাল রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলি একে একে প্রকাশ পেয়েছে—নিঃশেষিত হয়েছে রূপকের মধ্যে দিয়ে অরূপকে অজানাকে প্রকাশ করবার প্রয়াস। চব্বিশ বৎসরের তালিকা কম দীর্ঘ নয়—'শারদোৎসব' থেকে 'কালের যাত্রা'। ১৯০৮ সনে 'শারদোৎসব'—১৯২১ সনের 'ঋণশোধে' রূপান্তরিত, ১৯০৯ সনে প্রকাশিত 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি যদিও 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ভেঙে লেখা, এর মধ্যে ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সম্পূর্ণ অরূপ-পর্যায়ের; ১৯২৯ সনে এই নাটকেরই পরিবর্তিত সংস্করণ 'পরিত্রাণে' ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আরো প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং ১৯২২ সনে রচিত সম্পূর্ণ নতুন নাটক 'মুক্তধারা'য় এই ধনঞ্জয় বৈরাগীই প্রধান চরিত্র। ১৯১০ সনে 'রাজা' ১৯২০ সনের 'অরূপরতন' যার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ১৯১২ সনের গোড়ায় 'ডাকঘর' এবং মাঝামাঝি সময়ে 'অচলায়তন'—১৯১৮ সনের 'গুরু' 'অচলায়তনে'রই অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ, ১৯১৬ সনের 'ফাল্গুনী', ১৯২২ এর 'মুক্তধারা', ১৯২৬ সনের 'রক্তকরবী' এবং ১৯৩২-এর 'কালের যাত্রা'—যার দুই ভাগ, 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' এবং এখানেই রূপক নাটকের শেষ।

রূপক-নাট্যগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৩২৪, আশ্বিন-কার্তিক 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে প্রচুর ব্যাখ্যানমূলক ইঙ্গিত দিয়েছেন। প্রবন্ধটি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় নিবন্ধরূপে (পৃ. ৩৯-৭৯) প্রকাশিত হওয়াতে রবীন্দ্রনাথের ভিতরের মানুষটির পরিচয় পূর্ণতর হয়েছে। রূপক-নাট্যগুলি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যে ইঙ্গিত আছে তা এই:

"'শারদোৎসব' থেকে আরম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল—উপনন্দ—সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তাঁর সত্যকার সাথি মিলেছে, কেননা ঐ ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ—ঐ ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে—···

'শারদোৎসবে'র ভিতরকার কথাটাই এই—ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশীর সুর শুনবার কথা নয়।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে-অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে।···

যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি—তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়, কেননা নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে।··

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে-মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে-লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছন দিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ভরিয়ে ভরিয়ে মরি।

নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। 'ফাল্গুনী'র গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত-উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন করে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে, আনব সেই জরা বুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে।"

১৯০৮ সনেই 'শারদোৎসবে'র যখন প্রথম অভিনয় হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে, কবি তখন একটি নান্দী রচনা করেছিলেন ('ভারতী' কার্তিক ১৩১৫) যার মধ্যে শুধু 'শারদোৎসবে'র নয় সব ঋতু-রূপকনাট্যগুলিরই ভিতরের কথা খুঁজে পাওয়া যাবে। নান্দীটি এই :

"শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।
প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি',
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কবিতার গোড়ার কথা

১৩০০ সালের ২৭ আষাঢ়ে লেখা 'সোনার তরী'র "ভরা বাদরে" কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবক এই :

"নদী ভরা কূলে কূলে ক্ষেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।

কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।
ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো।
কদম্বগাছের সার
চিকনপল্লবে তার
গন্ধেভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো।"

এই ছোট্ট কবিতাটির কবি স্বয়ং দু জাতের কবিতার কথা বলেছেন—"একজাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্ক্ষার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।" —'রবি-রশ্মি', ১ম খণ্ড, ১ম সং পৃ. ২২৯

ওপরের কবিতাটি শেষ জাতের, এটি মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী। নদীমাতৃক বাংলা দেশের এই বর্ষাকালীন ছবির মধ্যে কাব্যরস কোথায়, হঠাৎ প্রশ্ন করলে চট করে জবাব জোগানো নাও যেতে পারে।

"এই কাব্যরস কী তাহা বলা শক্ত। কারণ, তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ; কিন্তু যাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই, কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র। কেবল যদি বলা যায় 'সুখ হইল' তবে একটা খবর দেওয়া হয়, সুখ দেওয়া হয় না।"—'সাহিত্য' সং. ১৯৫৮, পৃ. ২৩০

যে অনুভূতি থেকে কবির মনে কবিতার সঞ্চার হয়, সেটা যদি কোনো রকমে আবিষ্কার করা সম্ভব হত তবেই কবিতার এবং কাব্যের মর্মগ্রহণ সাধারণ পাঠকের পক্ষে সহজতর হত। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা তাত্ত্বিক

স্ব স্ব অর্জিত জ্ঞান ও বিদ্যার ভাবনা দিয়ে কবির কবিতা থেকে বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্বসকল পাক করে তুলতে পারেন, তাতে আর এক রকমের উপরি রস-সম্ভোগ কারো কারো ভাগ্যে ঘটতে পারে কিন্তু এমন করতে গেলে সাধারণ কাব্যরসিকের পক্ষে রসের ঘাটতি হয়; সোনা কণ্ঠশোভী অলঙ্কার না হয়ে কণ্ঠপথে রসায়নের কাজও করতে পারে কিন্তু তাতে প্রেমিকের সুখ নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"তত্ত্বপ্রচার করিয়া মানবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্বদা ব্যগ্র হইয়া আছে। কাব্যের মধ্যে মানবের সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করে। কাব্যের মর্যাদাও তাই। একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতার মধ্যে কোনো তত্ত্বই নাই, কিন্তু চিরকালীন মানব-প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ রহিয়া গেছে।...আত্মপ্রকাশের অর্থই এই, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহা প্রকাশ করা। কোন্‌টা কী তাহার দ্বারা বাহিরের বস্তু নিরূপিত হয়, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহার দ্বারা আমি নির্দিষ্ট হই।...কাব্যে আমরা আমাদের বিকাশ উপলব্ধি করি। তাহার সহিত নূতন তত্ত্বের কোনো যোগ নাই।...

হে বিষয়ী, হে সুবুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতা দেখিয়া তুমি যে বিজ্ঞভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ, বলিতেছ 'উহার মধ্যে নূতন জ্ঞান কী আছে' তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি তোমার সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান লইয়া মানবের এই পুরাতন প্রেমকে এমনি উজ্জ্বল মধুর ভাবে ব্যক্ত করো দেখি। যাহা কিছুতে ধরা দিতে চায় না সে মন্ত্রবলে ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে।... আমার প্রিয় মুখ যখন আমাকে আহ্বান করে তখন সে আমাকে আমার ক্ষুদ্রতা হইতে আহ্বান করে; যতই অধিক ভালোবাসি ততই আমার ভালোবাসার প্রাবল্যের মধ্যে আপনার বিপুলতা বুঝিতে পারি। প্রেমের মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনমুক্তি হয়।"—'সাহিত্য' ঐ, পৃ. ২৩০-২

আমাদের সৌভাগ্য এই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যে সব কাব্য ও কবিতা লিখেছেন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পিছু ফিরে তাকিয়ে সেগুলি কোন্ অনুভূতির বশে লেখা তা বলবার চেষ্টা করেছেন এবং বলবার অবকাশও পেয়েছেন। সমসাময়িক কালে বিজ্ঞান-রসিক ক্রিটিক বা মাসিকপত্রের সমালোচক তর্কের জাল ফেলে কাকচক্ষু কাব্য-সরোবরের জলকেও ঘোলাটে করাতে স্বয়ং কবির পক্ষেও তখন গভীরের খবর দেওয়ার যে অসুবিধা

ঘটেছিল, দীর্ঘ কালের ব্যবধানে শান্ত সংহত পরিবেশে অনেক কাব্যেরই মর্মকথা উদ্ঘাটন তিনি করতে পেরেছিলেন। তাঁর সেই ইঙ্গিতগুলিকেই আমরা চাবিকাঠিস্বরূপ ব্যবহার করতে পারি। রবীন্দ্র-কাব্যভাণ্ডারে প্রবেশ করে ভেদ করতে পারি রত্নরহস্যের। যাবতীয় 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র মুদ্রণ যদি তাঁর জীবিতকালে সম্পাদিত হত তাহলে আমরা আরও বেশি সৌভাগ্যের ভাগী হতাম। এরই মধ্যে সুখের বিষয় এই যে আমাদের কাল থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী কাব্যগুলির মর্ম-কথা তিনি বলে যেতে পেরেছেন। আগেই বলেছি, তিনি শুরু করেছেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'সোনার তরী' পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ব্যাখ্যান মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের কথায় এই :

'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'ছবি ও গান'—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের আর কোনো অপরাধ নেই কেবল একটি অপরাধ লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। 'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'কড়ি ও কোমলে' অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে কিন্তু সেই পর্বে কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। তারপর 'মানসী' থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালোমন্দ মাঝারির ভেদ আছে কিন্তু কবির আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-পর্বের আগের কবিতাগুলি সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিতপদে চলতে আরম্ভ করেছিল মাত্র, তারা ঠিক কবিতার পর্যায়ে এসে পৌছয় নি।

সমগ্র কাব্যরচনাবলী সম্পর্কে মোটামুটি এই রায় দিয়ে কবি ভিন্ন ভিন্ন কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য করেছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' তাঁর মতে—কপিবুক যুগের চৌকাঠ-পেরোনো কাব্য, কচি আমের গুটির সঙ্গে তুলনীয়—শ্যামল রঙ দেখা দিয়েছে, রস ধরে নি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম পরিচয়—উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু তা কবির নিজস্ব—সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের বিশেষ সাজ পরে এসেছিল—সে সাজ নতুন।

"আজ আসিয়াছি সন্ধ্যা,—বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদুস্বরে শুনাবারে
দু চারিটি গান।

সে গান না শোনে কেহ যদি,
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি,
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি
রচে দিস সমাধি-শয়ন।" (১ম সংস্করণ)

তারপর 'প্রভাতসঙ্গীত'। এই কাব্যে কবির প্রথম বিকাশোন্মুখ মন অপরিণত ভাবনা নিয়ে অপরিস্ফুট রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। তার পূর্বে তাঁর মনে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন চলছিল। 'প্রভাতসঙ্গীতে'র ঋতুতে আপনাআপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল একটা-আধটা মননের রূপ। তখন কোথা থেকে কবির মনের অন্দরমহলে কতকগুলো মত জেগে উঠে সদরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিল। ঐগুলো হচ্ছে "অনন্ত জীবন", "অনন্ত মরণ", "প্রতিধ্বনি"। "অনন্ত জীবন" বলতে কবি বুঝেছিলেন—বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মত আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা। ক্ষণে ক্ষণে হাঁ এবং ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়, বিশ্বচরাচর গোচর অগোচরের নিরবচ্ছিন্ন মালা গাঁথা। প্রতিমুহূর্তের সমস্ত ভালোমন্দ, প্রতিদিনের সুখদুঃখের সমস্ত অভিজ্ঞতা চিরকালের মত অনবরত একটা সৃষ্টিরূপ ধরছে, প্রকাশ অপ্রকাশের নিত্য ওঠাপড়া নিয়ে যে সৃষ্টির স্বরূপ। ভাবতে ভাবতে কবির মনে প্রশ্ন জেগেছিল মৃত্যু তাহলে কি? একটা উত্তরও মনে জুগিয়েছিল—জীবন সব কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। মানুষ প্রতিমুহূর্তেই মরছে আর সেই মরার ভিতর দিয়েই বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছে, যেন মানুষের মধ্যে সেলাইয়ের কাজ চলছে, গাঁথা পড়ছে অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। মুহূর্তকালীন মৃত্যুপরম্পরা দিয়ে মর্ত্যজীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবালদ্বীপের মত, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রত্যেক মানুষকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের অভিজ্ঞতার জাল বিস্তার করে চলবে—তার চেতনার সূত্রটিকে নিয়ে মৃত্যু এক এক ফোঁড়ে এক এক লোককে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথবে। এই ধরনের চিন্তা কবিকে খুব আনন্দ দিয়েছিল এই

কালে। "প্রতিধ্বনি" কবিতা লিখেছিলেন কবি যখন প্রথম দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন। তাঁর তখন মনে হয়েছিল, বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে একটা ধ্বনি, আর সে প্রতিধ্বনিরূপে মানুষকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতিপ্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনিরূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে, রূপ হয়ে, ধ্বনি হয়ে। এইসব ভাব কবির মনের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে তখন আন্দোলিত হয়েছিল কিন্তু কবির ধারণা তিনি তখনো পান নি ভাষা-ভারতীর প্রসাদ। তাই তাঁর মতে 'প্রভাতসঙ্গীতে'র সাহিত্যিক মূল্য বেশি নয়।

"অরুণময়ী তরুণ উষা
জাগায়ে দিল গান ;
পূরবমেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।" (১ম সং)

'ছবি ও গান'কে কবি বলেছেন তাঁর বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন যখন সবে মিলছে। কামনা কেবল সুর খুঁজছে না, রূপ খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু আলো আঁধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তৈরি হয় নি। কবি তখনো সংসারে প্রবেশ করে নি, তখনো বাতায়নবাসী। দূর থেকে যা আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়। এর কোনোটা চোখে দেখা একটুকরো ছবি পেনসিলে আঁকা, রবারে ঘষে দেওয়া, আর কোনো কোনোটা সম্পূর্ণ বানানো। মোটের উপরে অক্ষম ভাষার ব্যাকুলতায় সবগুলিতেই বানানো ভাব প্রকাশ পেয়েছে, সহজ হয় নি। কিন্তু সহজ হবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। সেইজন্যে চলতি ভাষা আপন এলোমেলো পদক্ষেপে এর যেখানে সেখানে প্রবেশ করেছে। কবির ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হল। 'ছবি ও গান' 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকা করে দিলে।

"বিজন ঘরে বাতায়নে,
সারাদিন আপন মনে,

ব'সে ব'সে বাইরে চেয়ে দেখি,
টুপ্‌টুপ্ বৃষ্টি পড়ে,
পাতা হতে পাতায় পড়ে,
ডালে ব'সে ভেজে একটি পাখী।" (১ম সং)

'কড়ি ও কোমল' কবির নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন, তখন তাঁর মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। এই আত্মবিস্মৃত বে-আইনী প্রমত্ততা 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা পূর্ববর্তীদের প্রভাববর্জিত, কবির মনের অন্তঃস্তরের উৎস থেকে উছলে উঠেছিল। কবির এই প্রথম বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর একটা প্রবল প্রবর্তনা যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই কাব্যকে অধিকার করেছে—জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। পরবর্তী কালে মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি রবীন্দ্রকাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা—নানা বাণীতে যার প্রকাশ। 'কড়ি ও কোমলে'ই তার প্রথম উদ্ভব। কিন্তু এই কাব্যের আসল কথা হচ্ছে—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।" (১ম সং)

এইখানেই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার গোড়ার কথা শেষ হয়েছে, আরম্ভ হয়েছে 'মানসী'-'সোনারতরী'র দিগ্বিজয়, নিখিল ভুবন পরিপ্লাবিত করেছে রবীন্দ্র-কাব্য-বলাকার পক্ষধ্বনি।

রবীন্দ্র-কাব্য : শব্দচয়ন

সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের সামান্য বোধ আছে অথবা পূর্বাপর বাংলা ভাষার কবিতা ও গান শুনে শুনে যাঁদের কান একটু ঠিক হয়েছে, শোনা মাত্রই তাঁরা ধরে ফেলতে পারেন, এটা রবীন্দ্রনাথের রচনা বা এটা তাঁর নয়। খুব পাকা হাতের দু-একটা নকল ছাড়া এ বিষয়ে ভুল হবার জো নেই। এই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের শব্দচয়ন ও বাক্যগ্রন্থন

বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর সার্থকনামা সাহিত্যশিল্পী মাত্রেরই অনুবিস্তর এই বৈশিষ্ট্য আছে, কেউ এটি প্রয়োগ করেন নিজের অজ্ঞাতসারে, আবার কেউ কেউ অত্যন্ত সজাগসচেতন ভাবে। সচেতন শিল্পীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে কাব্যে ভারতচন্দ্র এবং গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অচেতন শিল্পীদের মধ্যে চণ্ডীদাসের নাম সর্বাগ্রে করা যায়। রবীন্দ্রনাথে চেতন ও অচেতন দুইয়েরই শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রায় আদিকাল থেকে শুধু ভাষা ও ভঙ্গি দিয়ে তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হয় না। অবিশ্যি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র আগে পর্যন্ত তিনি কখনও বিহারীলাল, কখনও হেমচন্দ্র, কখনও বঙ্কিমচন্দ্র, আবার কখনও বা বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসকে অনুকরণ করে করে মকৃশ করেছেন, কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। 'কড়ি ও কোমলে' এই নিজস্বতা এতই বেশি প্রকট হয়ে পড়ে যে সে কালের সমালোচক ও ব্যঙ্গবিদেরা এ নিয়ে তাঁকে লাঞ্ছনা করতেও ছাড়েন নি। "পুলক" শব্দের রাবীন্দ্রিক প্রয়োগ নিয়ে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা অপুলকের ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক, এ ঝড় থামতে দেরি হয় নি এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর একার জীবনে বিচিত্র শব্দ ও ভাবগৌরবে বাংলা সাহিত্যকে হাজার বছরের সমৃদ্ধি দান করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন।

শব্দচয়ন ও গ্রন্থনের দুঃসাহসিকতা দেখাতে না পারলে কোন সাহিত্যশিল্পীই বড় স্রষ্টা হতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাজার বাংলা শব্দকে নতুন ব্যঞ্জনা দান করেছেন। দুঃখের বিষয়, শেক্সপীয়র ও ব্রাউনিং-এর মত রবীন্দ্র-অভিধান এখন পর্যন্ত কেউ প্রস্তুত করেন নি ; করলে দেখা যেত আমাদের মাতৃভাষা তাঁর দ্বারা বিচিত্র শব্দগৌরব লাভ করেছে। তাঁর রসবোধ আর কান এই কাজে তাঁর সহায় ছিল, ধ্বনিসামঞ্জস্য বিধানে তাঁর সুর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে। শব্দচয়ন ব্যাপারে অনুপ্রাসের দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি—দ্বাত্ত রায়কে এ নিয়ে ব্যঙ্গ করা সত্ত্বেও। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১। নিকটে যে কটি আছিল কুটির
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখীর
কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি' ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মাণিক ঝলকি' আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।
কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী ;
মৃণাল-ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে-প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে,
আকাশ উঠিল আকুলি'।

২। দূরে একদিন দেখেছিনু তব কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক-আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে করিছ চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক-আভরণ।

৩। যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

৪। গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা

কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।……

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে,
হৃদয় নাচেরে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে, ময়ূরের মতো নাচেরে।

এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। চরণান্তিক উত্তম মিলের জন্যেও রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র শব্দচয়নে উৎসাহিত হয়েছেন। দুটি কবিতায় বিশেষ করে এর চমৎকার উদাহরণ আমরা পাই, 'সোনার তরী'র "পুরস্কারে" এবং 'কাহিনী'র "লক্ষ্মীর পরীক্ষা"য়। যেমন,

গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব—
মাথা ও মুণ্ড, ছাই ও ভস্ম
মিলিবে কি তাহে হস্তী অশ্ব,
না মিলে শস্যকণা।…
নানা বেশভূষা হীরা রূপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা
সাজ করে নাও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।…
আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিভরা দুটি লইয়া চরণ
চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ
পবিত্র পদপঙ্কে।

অথবা

কতই বা সয় রক্তমাংসে
কত কাজ করে একটা মানুষে।…
হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দুর
সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধুর।…
সামনে প্রণাম পদারবিন্দে,
আড়ালে তোমার করে যে নিন্দে।…

গয়লা ত নন যুধিষ্ঠির
যত বিষ তব কুদৃষ্টির।...
বড়লোক তুমি ভাগ্যিমন্ত,
সেই মত চাই চালচলন্ ত?

এই অন্ত্য মিলের চরম নিদর্শন আমরা দেখতে পাই শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কাছে লেখা চিঠিতে—

শ্রাবণে ডেপুটি-পনা
এতো কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এযে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।

'কল্পনা'র "জুতা-আবিষ্কার" কবিতায় অনেক কৌতুককর দৃষ্টান্ত আছে, যথা—

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশককাঁখে একুশ লাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিকো চলে কিস্তি।
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা।
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা।

এই অসামান্ত স্বরবোধের জন্তেই রবীন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডার মুহুর্মুহু আক্রান্ত হয়েছে। টান ধরলেই তিনি নানাভাবে সে ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন; ফলে শব্দচয়নে কোনও দিনই তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। তাঁর কাব্যসাহিত্য আরও বিশিষ্টতা লাভ করেছে তাঁর উদার প্রসন্ন হাস্তরসিকতার জন্তে, তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবোধের দরুন। সাধারণ যে কবিসমাজের কাছে বিচিত্র শব্দের কোনও দিনই প্রয়োজন হবে না, কোকিল জ্যোৎস্না মলয় বসন্ত প্রেম প্রীতি ভালবাসার বন্তা বইয়ে দিয়েই যাঁরা নিশ্চিন্ত, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দলে নন। তাঁর কাব্য বহুমুখী। তাঁর বিস্তার বিশ্বব্যাপী, তিনি আনন্দ মঙ্গল ও সুন্দরের কবি হলেও, আলোকের বন্তায় পৃথিবী ভাসিয়ে দিলেও, দুঃখপীড়নব্যথাবেদনা ও অন্ধকারকেও তিনি সমান ঠাঁই দিয়েছেন কাব্যে, সুতরাং তাঁর ভোকাবুলারি বা শব্দসম্ভার স্বতঃই হয়ে উঠেছে বিপুলায়তন। শব্দচয়ন বিষয়ে তাঁর সবচাইতে

স্বাতন্ত্র্য এই যে তিনি সেই নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই আমাদের চলতি ভাষার ভাণ্ডারে খুব বেশি করে নির্ভর করেছেন; দেশজ বা অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দকে তিনি অতি উচ্চবর্ণ সমাজে সাদরে স্থান দিয়েছেন; চলতি ও সাধু, কঠিন গুরুগম্ভীর ও হাল্‌কা-লঘুর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে দুই বিপুলস্রোতা নদীকেই মিশিয়ে দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যসাগরে। তাঁর ছন্দবোধ এবং সুরবোধ অর্থাৎ তাঁর কানই হয়েছে তাঁর সহায়। তার ওপর তাঁর অসামান্য রসবোধ বা সাহিত্যবুদ্ধি সর্বত্র দুই বিপরীতের মিলন এমন সুকৌশলে ঘটিয়েছে যে সমগ্র রক্ষণশীল বাংলাদেশ ধীরে ধীরে তাঁরই দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরই নির্দেশকে চরম বলে মেনে নিয়েছে। এর জন্যে অবিশ্যি তাঁকে কবিতা শোনানো ছাড়াও তত্ত্ব-কথাও অনেক শোনাতে হয়েছে। তাঁর 'শব্দতত্ত্ব', তাঁর 'বাংলাভাষা পরিচয়' সেই পরিচয় চিরদিন বহন করবে। শব্দচয়নে এই সর্বগ্রাসী বুদ্ধি ছিল বলেই তিনি প্রায় একই সঙ্গে লিখতে পেরেছেন—

কোথা কনখল
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গি করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

এবং

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝিতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা,
কাতরে কহে, "কাছে আয়!"
বনের পাখি বলে, "না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।"
খাঁচার পাখি বলে, "হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।"

এবং দুয়ের সমন্বয়ে—

কমলফুল বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা।...

আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি,
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।

সুতরাং এই রবীন্দ্রনাথই পরে লিখতে পেরেছেন—

তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয় রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর রক্তধূলির পথবিপথে
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত,
স্বপ্নে চলার পথিক মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে
বিহঙ্গগান শান্ত তখন গহন রাতের বসন ছায়ে।...ইত্যাদি

এই সমন্বয়রীতির পরম পরিণতি—রবীন্দ্রনাথের গান এবং এই গানেই তাঁর শব্দচয়ন-সাফল্যের চরম সার্থকতা আমরা দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস—'যোগাযোগ'

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের প্রথম শক্তিশালী কবি মধুসূদন যেরূপ শুধু কবিতা নহে, গদ্যের বিভিন্ন বিভাগেও বহু নূতনত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ গদ্যের বহু বিভাগে বহু অভিনবত্বের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন ; উভয়েই গদ্যরচনার বিবিধ ফর্ম বা রূপের আদি পথপ্রদর্শক বা প্রবর্তক। প্রহসন দুইটি ও 'হেক্‌টর বধ' যেমন গদ্যে মধুসূদনের প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করিতেছে, তেমনই গদ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার চিরস্মরণীয় কীর্তি বহু। বিশেষ করিয়া বাংলা কথাসাহিত্যে যে ছোটগল্প ও মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের আমরা গৌরব করি, সেই দুটি বস্তুই প্রথম সার্থক রূপ লইয়াছে রবীন্দ্রনাথেরই লেখনীতে। প্রায় একশত ছোটগল্পের (নূতন সংস্করণ 'গল্পগুচ্ছে' চুরাশিটির স্থান হইয়াছে) স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এখনও আদর্শ ছোটগল্প-লেখক হিসাবে কীর্তিত হইয়া থাকেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসাবে ততটা ব্যাপক কীর্তি অর্জন করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার উপন্যাসে সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য ঘটনা, বস্তু ও বৈচিত্র্য কম, প্রত্যক্ষ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত

অনেক বেশি। মনের গহন-গভীরে তাঁহার নায়ক-নায়িকার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে অলস অবসর-বিনোদনেচ্ছু পাঠকের স্বভাবতঃই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, সে হাঁপাইয়া উঠে। তাহা ছাড়া তাঁহার উপন্যাসে চরিত্র কম, ঘটনা-সংস্থান আশানুরূপ নহে, পরিবেশও প্রত্যক্ষ বাস্তব হইতে ভাবরাজ্যের বেশি অনুগামী। গল্পের গতি বা প্রবাহ ঘটনা হইতে ঘটনায় অথবা চরিত্র হইতে চরিত্রে নহে—ভাব হইতে ভাবে, তাহার বারো আনাই মানস-গোচর। অপরিণত রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ "করুণা" এবং সম্পূর্ণ 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' পূর্বগামীদের অনুকরণবাহুল্যে এই দোষ হইতে মুক্ত হইলেও 'নষ্টনীড়' অর্থাৎ যে কাহিনী হইতে তাঁহার রচনার মোড় ফিরিয়াছে, এবং পর পর 'চোখের বালি' 'নৌকাডুবি' 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' 'চতুরঙ্গ' 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' 'দুই বোন' ও 'চার অধ্যায়' অল্প-বিস্তর মনস্তত্ত্বপ্রধান। প্রত্যেকটি উপন্যাসেরই মূল অতিশয় জটিল এবং মানবীয় সম্পর্কের অতি সূক্ষ্ম দাবির উপর কাহিনীর আর্গুমেণ্ট বা প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত। এই জটিল অন্তর্মুখী প্রবাহের অন্যতম তরঙ্গ 'যোগাযোগ'।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে কবি শিলং গিয়াছিলেন। সেইখানেই একটি সুবৃহৎ উপন্যাসের পরিকল্পনা তাঁহার মনে জাগে। একটি বংশের পর পর তিন পুরুষকে অবলম্বন করিয়া একটি অতিশয় জটিল ও সূক্ষ্ম ভাবকে বিচিত্র রূপদান করিবার ইচ্ছাবশতঃই তিনি রচনা করিতে আরম্ভ করেন 'তিন পুরুষ'। শিলং-এ এই উপন্যাসের গোড়াপত্তন হয়। খানিকটা লেখা হয়, এমন সময় তিনি পূর্ব-এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করিতে মনস্থ করেন। ১২ই জুলাই (১৯২৭) এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে তিনি এই উপন্যাসের যতটুকু লেখা হইয়াছিল প্রকাশের জন্য 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রের সম্পাদককে দিয়া যান। ১৩৩৪ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯২৭) সংখ্যা হইতে 'তিন পুরুষ' 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতে থাকে। অক্টোবর মাসে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং আবার 'তিন পুরুষ' রচনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু 'বিচিত্রা'র কার্তিক সংখ্যায় দ্বিতীয় ইনস্টলমেণ্ট বাহির হইবার পরেই তিনি নাম পরিবর্তন করিয়া উপন্যাসের নাম দেন 'যোগাযোগ'। ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ হইতে 'যোগাযোগ' নামেই বইটি বাহির হইতে থাকে, এবং রবীন্দ্রনাথও লিখিয়া যাইতে থাকেন উৎসাহের সহিত। কিন্তু এই উৎসাহ বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ আমরা দেখিতেছি, ওই সালের ৪ই ফাল্গুনের একটি চিঠিতে তিনি

দিলীপকুমার রায়কে লিখিতেছেন—"আমি কুক্ষণে 'যোগাযোগ' বলে একটা গল্প লিখতে বসেছিলেম।…দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কিছুতেই লেখার সময় পাচ্ছিনে।" কোনও রকমে রবীন্দ্রনাথ তিন পুরুষের ভিতর মাত্র এক পুরুষের গল্প শেষ করেন এবং ১৩৩৫ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় এই অংশ বাহির হয়। ১৩৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে আবার তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশ ভ্রমণের জন্য কলম্বো পর্যন্ত যান; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বিলাত যাওয়া স্থগিত রাখেন এবং বাঙ্গালোরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অতিথি হইয়া কয়েকদিন থাকেন। এবারের এই অসমাপ্ত ভ্রমণের মধ্যেই তিনি আর একখানি উপন্যাসে হাত দেন এবং বাঙ্গালোরে বসিয়াই ১৩৩৫ সালের ১৪ই আষাঢ় তারিখে (২৮ জুন, ১৯২৮) উপন্যাসখানি শেষ করেন—এই নূতন উপন্যাসখানি 'শেষের কবিতা'। 'শেষের কবিতা' রচনার উৎসাহে 'তিন পুরুষ' বা 'যোগাযোগ' চাপা পড়িয়া যায়। দ্বিতীয় পুরুষ অবিনাশের জন্ম পর্যন্ত আসিয়া আমরা পৌঁছাই না।

প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে দেশে ফিরিবার পথে জাহাজে বসিয়াই ("কিন্তা" জাহাজ। ৪ অক্টোবর, ১৯২৭) তিনি 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের নাম বদলের একটি ধোঁয়াটে কৈফিয়ত দাখিল করেন। অগ্রহায়ণের 'বিচিত্রা'য় পরিবর্তিত নামের সহিত সেইটি বাহির হয়। আসল কারণটি এই যে, তাঁহার নিকট খবর পৌঁছায়, জলধর সেনের 'তিন পুরুষ' নামে একটি উপন্যাস আছে। তিনি কিন্তু এই কারণের উল্লেখমাত্র করেন নাই। সম্ভবতঃ লেখাটি সম্বন্ধে মোহ ও উৎসাহ তাঁহার ততদিনে কাটিয়া গিয়া থাকিবে। তখন হইতেই তিন পুরুষকে এক পুরুষে সীমাবদ্ধ করিবার সঙ্কল্প তাঁহার মনের ভিতর কাজ করিতে থাকে এবং তিনি কৈফিয়তে লেখেন—

"সম্পাদক মশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন 'তিনপুরুষ' নামটা দিয়ে তাঁকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন ক'রে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগলো, 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। 'ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা' ইত্যাদি। কাহিনী বলে, 'তার মানে কী হল?' নাম বলে, 'বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ ক'রে চলাই তোমার ধর্ম।' কাহিনী বলে, 'রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই

সেটা বেকবুল যেতে চাই।' কর্তা বলেন,—তিন-পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চ'লে আসবে এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই।...অতএব সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে।...'তিনপুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল 'যোগাযোগ'।"

উপন্যাস রচনার এই ইতিহাসটুকু পাঠকের জানা প্রয়োজন, কারণ এই উপন্যাসের কাহিনীর ভিতরে অসমতা ও অসামঞ্জস্য এই কারণেই ঘটিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচকগণ অনেকেই এই উপন্যাসের ত্রুটি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বিচলিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মূল কথাগুলি হইতেছে এই: উপন্যাসের আরম্ভ ও শেষ অত্যন্ত আকস্মিক। বইয়ের গোড়ায় আমরা দেখিতেছি, অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশ জন্মোৎসব, আর বই শেষ করিয়া আমরা দেখিলাম, অবিনাশের আগমনসম্ভাবনা মাত্র সূচিত হইয়াছে, সে তখন পর্যন্ত ভূমিষ্ঠ হয় নাই। গল্পের গঠনও শিথিল, ইহার বিভিন্ন অংশ গাঢ়বদ্ধ ও সংহত নহে। মধুসূদনের বংশ ও জীবনের পূর্ব ইতিহাসের বিস্তৃত পরিচয় হয়তো দরকার ছিল, কিন্তু কুমুদিনীর বাপের বাড়ির এত দীর্ঘ বর্ণনা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। ইহাকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াও মনে হয়, কারণ গল্পের আয়তনের তুলনায় এই পরিচয় অতিমাত্রায় প্রলম্বিত। মুকুন্দলাল ও তাঁহার স্ত্রীর কাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গল্প, সেটিও এই দীর্ঘ ভূমিকার ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রদাস ও কুমুদিনী—ভাই ও বোনের অপরূপ মধুর সম্পর্ক লইয়া আর একটি বই হইতে পারিত; কিন্তু মধুসূদন-কুমুর কাহিনীর ভিতরে তাহা যেন একটু অনাবশ্যক রকম বেশি জায়গা জুড়িয়া আছে। কুমু মধুসূদনের ঘর ছাড়িয়া বাপের বাড়ি অর্থাৎ ভাইয়ের বাড়ি চলিয়া আসিবার পর অনেক পাতা জুড়িয়া স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, স্ত্রীর অধিকার ইত্যাদি লইয়া যে সূক্ষ্ম তর্কজাল রচিত হইয়াছে, মূল আখ্যানবস্তুর দিক হইতে তাহাও কতকটা অবান্তর।

আসলে যে উপন্যাস লিখিবার বাসনা কবির মনে ছিল ইহা তাহার ভূমিকামাত্র, বই পড়িয়া মনে হয়, অবিনাশের জীবনীর বিস্তৃত পরিচয়ের ভিতরেই এই উপন্যাসের পরিণতি নিহিত থাকা উচিত ছিল; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং মধুসূদন ও কুমুদিনীর কাহিনীই—তাহাদের বাল্য ও কিশোর জীবনের পরিবেশ এবং যৌবনে দাম্পত্য জীবনের সূক্ষ্ম ও স্থূল লীলা

ও বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতই এই উপন্যাসটির প্রধান উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের মনে হয়, গঠনের দিক হইতে বিভিন্ন শৈথিল্য ও ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা কথা-সাহিত্যে 'যোগাযোগ' এক অপূর্ব সৃষ্টি। প্রাচীন বংশগৌরব ও প্রবল ভদ্রতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং অসাধারণ সহনশীলতা লইয়া যে দুই ভাই-বোন আধুনিক টাকা-আনা-পাইয়ের সংসারে প্রায় বেমানান বলিয়া ঠেকিতেছিল, হঠাৎ-পাওয়া-ঐশ্বর্যের-দম্ভে-স্ফীত মধুসূদনের সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদের উভয়ের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল, এই উপন্যাসে অপরূপ নিপুণতার সহিত তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এমন সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ বাংলা উপন্যাসে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। মধুসূদনের মন বলিয়া পদার্থ নাই, অথচ বিপ্রদাস ও কুমুদিনী যেন দেহহীন মনেরই সমষ্টি। সুতরাং সংঘাতটি বিচিত্র হইয়াছে। স্থূল মধুসূদনের পক্ষে স্থূলা শ্যামার আকর্ষণ আকস্মিক ও অজ্ঞাত নহে, কিন্তু কুমুদিনীকে চেনা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। সে চিনিলও না। এই না চেনার ভিতরে বিপিন আর মোতির মার প্রাণপণ প্রয়াসই হইতেছে আসল 'যোগাযোগ'।

'যোগাযোগ' উপন্যাসের বিষয়ানুগ নামকরণ হওয়া উচিত ছিল—কুমুদিনী, কারণ কুমুদিনীই ইহার কেন্দ্র। এই কুমুদিনী মা হিসাবে এবং সহধর্মিণী বা প্রিয়া হিসাবে সার্থক নহে, চিরন্তন নারীত্বে ইহার প্রতিষ্ঠা। এই দুর্ভাগ্য দেশের অবহেলিত ও লাঞ্ছিত নারীত্বের সকল মর্যাদা ও গৌরব লইয়া সে যেন একা দাঁড়াইয়া আছে, মধুসূদনের স্থূল অত্যাচার ও অবমাননা ইহার সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করিতে পারিল না। ইহাকে শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত করিতে পারিলেই রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাস চরম সার্থকতা লাভ করিত। কুমুদিনী সহজাতসংস্কারবশে নারীত্বের অধিকারের যে ধারণা মনে মনে পোষণ করিত, সে শুধু সেই অধিকারটুকু চাহিয়াছিল, স্বামীর নিকট হইতে অনুগ্রহ চাহে নাই। পতি পরম গুরু—'নৌকাডুবি'র কমলার এই সংস্কার তাহার ছিল না, স্বামীর ক্ষুদ্রতা ও নীচতা তাহাকে পীড়িত করিত। বীণা যেরূপ সহজভাবে ওস্তাদ বীণকারের স্পর্শে বাজিয়া উঠে, কুমু বাজিতে চাহিয়াছিল সেই ভাবে; কিন্তু বর্বর মধুসূদনের হাতে সে বীণা বাজিল না। মধুসূদন শুধু দরজায় অধিকারের করাঘাত করিয়াই হয়রান হইয়া গেল, প্রবেশাধিকার পাইল না। উপর স্বত্বের দাবি লইয়াই সে মাতিয়া রহিল, সহানুভূতির নিপুণ করস্পর্শে

সে গাছে ফুল ফোটাইতে পারিল না। 'যোগাযোগ' এই ব্যর্থতায়, জয়বদ্ধ মধুস্থদনের এই পরাজয়ের ইতিহাস। কুমু একদিন মধুস্থদনকে বলিয়াছিল, "তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।" লয়ও নাই, কিন্তু ব্যথায় জর্জরিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জর্জরিত হইয়াছিল সভ্যতা ও আভিজাত্যের অবতার বিপ্রদাস। ভাই ও বোন পরস্পর পরস্পরকে এই আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্ম বরাবর প্রাণপণ করিয়াছে এবং এই চেষ্টার ভিতরে ভাইবোনের এক মধুরতম সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে—যাহার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে মেলা ভার। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য নারী-চরিত্রের সহিত কুমুর চরিত্রের পার্থক্য তাহার এক উক্তি হইতেই বোঝা যায়। সে বলিতেছে—"জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে, এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না, যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে ক'রে।"

কুমু চরিত্রের আরও বৈচিত্র্য পরিস্ফুট হইয়াছে যখন আমরা দেখিতে পাইলাম তাহার গর্ভে মধুস্থদনের সন্তানের আগমনসম্ভাবনাও তাহার মহনীয় নারীচরিত্রকে এতটুকু খর্ব করিতে পারিল না। সমস্ত উপন্যাসের চরম কথাটি আমরা উপন্যাসের ৫৭(এক কম শেষ)-তম অধ্যায়ে পাইতেছি। সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া 'যোগাযোগে'র পরিচয় সম্পূর্ণ করিতেছি। কুমু নারীত্বের সমস্ত গৌরব লইয়া, মা হইবার আশু সম্ভাবনা লইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছে দাদার নিকটে। ভাই বোনের কথা দিয়া উদ্ধৃতি শুরু :

"দাদা, সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।"

"আচ্ছা, আগে হক ছেলে, তার পরে বলিস।"

"তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু মার কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছামৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন, দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।"

আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। হঠাৎ হু হু করে বাতাস উঠল, টিপায়ের উপর বিপ্রদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো ফর ফর করে উলটে যেতে লাগল। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভরে।

কুমু বললে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে করো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা। সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব, চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যে-রকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারিদিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলে নি জগৎটাকে। এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে,—কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি; সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তাহলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে-গারদে ঢুকতুম না।"...

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে ছন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় এত বেশি আলোচনা করে গেছেন যে তিনি মহাকবি এ কথাটা মনে না রাখলে আমরা তাঁকে একজন পাকা ছান্দসিক বলে ভাবতে পারি। ছন্দ নিয়ে একখানা বইও তাঁর বেরিয়েছে—'ছন্দ', আষাঢ়, ১৩৪৩। তা ছাড়া, বিভিন্ন ছন্দবেত্তাদের সঙ্গে চিঠিপত্র-মারফত ও মৌখিক আলাপ-আলোচনায় তিনি

বাংলা ছন্দের এত রকমের ধর্ম, কৌশল ও রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন যে সেগুলি একত্র সংগৃহীত হলে বাংলাছন্দের আর একখানা মূল্যবান গ্রন্থ হতে পারে।

কিন্তু এসব বাহ্য। রবীন্দ্রনাথ যে জাতের কবি তাঁদের কাব্য-বিচারে ছন্দের কথাই নিষ্প্রয়োজন। ছন্দ তাঁকে কোনোদিনই চালনা করে নি, তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে ছন্দ আপনা-আপনি ধরা দিয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে। তবু ইতিহাসের দিক থেকে কিছু বলা দরকার।

বাংলা ছন্দের আদিতে যদি ধরি প্রথম বৌদ্ধচর্যাপদকারকে, বাংলা ছন্দের বিবর্তনে সবশেষে নাম করতে হবে রবীন্দ্রনাথের। তিনি যে শুধু বাংলা পয়ার ত্রিপদীকেই চরম পরিণতিতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন তাই নয়, কাব্য-সাধনার ধাপে ধাপে ছন্দ-বিবর্তনের প্রায় সকল স্তর পার হয়ে বঙ্গ-ভারতীর বীণায় একশোআট রাগ-রাগিণীর ঝংকার তুলেছেন।

তাঁর গোড়ার ইতিহাস স্বভাবতঃই অনুকরণের। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-শশিশেখর-জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবপদকর্তাগণ, কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত) প্রভৃতির আদর্শ তো পিছনে ছিলই, সামনেই ছিল রঙ্গলাল-মধুসূদন-বিহারীলাল-দ্বিজেন্দ্রনাথ-হেমচন্দ্র-অক্ষয়কুমার (চৌধুরী) প্রভৃতির বিচিত্র ও বিবিধ আদর্শ। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারী-লালের সম্পূর্ণ নিজস্ব ঢঙের কবিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের ভাষার উপযোগী বাহন, ভাষা-ছন্দ আবিষ্কার না করা পর্যন্ত বালক এবং কিশোর রবীন্দ্রনাথ পূর্বগামীদের ছন্দ-ভাব-ভাষার অনুকরণ করে প্রাথমিক মক্শটা সেরে নিয়েছিলেন। হারিয়ে-যাওয়া নীল কাগজের খাতা, লেট্স ডাইরি এবং পরবর্তী আর একখানি খাতায় এই অনুকরণ-অনুসরণের ইতিহাস ছিল এবং শেষেরটিতে এখনো আছে। কবি নিজে সামান্য কিছু নমুনা তাঁর স্মৃতি থেকে 'জীবনস্মৃতি'তে দিয়েছেন।

কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতি-কবির গৌরব অর্জন করবেন পরের পথ তাঁর পথ হতেই পারে না। "কবি-গুরু" বিহারীলালের গতানু-গতিকতা বর্জনের সহজ পথ তিনি গ্রহণ করলেন, একেবারে নিজস্ব ছন্দে ও ভাষায় নিজের কথা বলা শুরু হল—শুরু হল 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'।

পদ্য ও ছন্দ সম্বন্ধে কবিকে প্রথম পাঠ নিতে দেখি বয়সে-অনেক-বড় ভাগিনেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছ থেকে—আন্দাজ সাত বছর বয়সে।—"এক-

দিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।' বলিয়া, পয়ারছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।"—'জীবনস্মৃতি'।

শিশুকবি কিন্তু সে পথে গেলেন না। পয়ার, ত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, শিখরিণী—এই সব শাস্ত্রসম্মত ছন্দের উপাসক কবি তিনি নন। বরঞ্চ বলা যেতে পারে তিনি ছন্দের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন বিহারীলালের কাছ থেকে। 'জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ আছে—

"মনে আছে, একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ-স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে—হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ-স্বরের দ্বারা বিস্ফারিত করিয়া দেখাইবার জন্যই 'দেবতাত্মা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নগাধিরাজ' পর্যন্ত কবি এতগুলি আ-কারের সমাবেশ করিয়াছেন।"

বিষয়বস্তুর প্রয়োজন, মহিমা ও মর্যাদা অনুসারে ছন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হলেই কাব্যের উৎকর্ষ, এই বোধ রবীন্দ্রনাথকে গতানুগাতকতার হাত থেকে বাঁচিয়ে স্বকীয় পথে পরিচালিত করেছিল। 'কবি-কাহিনী', 'বনফুল', 'বাল্মীকি-প্রতিভা' এবং 'ভগ্নহৃদয়ে'র কবি নিজের পথ ধরে রাতারাতি অদৃশ্য জাদুস্পর্শে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' ও 'ছবি ও গানে'র কবি হয়ে উঠলেন। এই হঠাৎ আবিষ্কৃত নিজস্বতা পরবর্তী ষাট বছর (১২৮৮ থেকে তিরোধানের বছর ১৩৪৮) কবির হাতে নানা বিচিত্র ছন্দে রূপায়িত হয়ে উঠলেও রবীন্দ্রনাথ ছন্দবিদ্ কবি নন, সুর ও ভাবের কবি। তাঁর মতে, "আবেগকে প্রকাশ করতে গেলে কথার মধ্যে সেই আবেগের ধর্ম সঞ্চার করতে হয়। আবেগের ধর্ম হচ্ছে বেগ। কথা যখন সেই বেগ গ্রহণ করে তখনই আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে তার মিল ঘটে। এই বেগের কত বৈচিত্র্যই যে আছে তার ঠিকানা নেই। এই বেগের বৈচিত্র্যেই তো আলোকের রং বদল হচ্ছে, শব্দের সুর বদল হচ্ছে এবং লীলাময়ী সৃষ্টি রূপ থেকে রূপান্তর গ্রহণ করছে।" —'ছন্দ', পৃ. ৪।

আগেই বলেছি রবীন্দ্র-কাব্যে এই রূপান্তর পয়ার থেকে অমিত্রাক্ষরে বা তিন মাত্রার থেকে নয় মাত্রার রূপান্তর নয়, এ রূপান্তর হচ্ছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-'প্রভাতসঙ্গীত'-'ছবি ও গান' থেকে 'কড়ি ও কোমল'-'মানসী'-'সোনার-

তরী'তে এবং তারও পরে, 'চিত্রা'-'কল্পনা'-'ক্ষণিকা'য় এবং সবশেষে 'চৈতালি'-'উৎসর্গ'-'বলাকা'য়।

এই কাব্য-যাত্রার মধ্যে আর একটি মাত্র ছন্দসূত্র রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে পালন করেছিলেন; সূত্রটি বাংলা ছন্দে যুক্ত অক্ষরের প্রয়োগ নিয়ে। এই আবিষ্কার ও প্রয়োগ যে 'মানসী'র যুগ থেকেই সে কথা কবি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'তে 'মানসী'র ভূমিকায় এই ভাবে স্বীকার করেছেন—

"আমার রচনায় এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।"

এই কথাটাই তিনি প্রথম বলেছিলেন ১৩০১ আষাঢ়ে, বিহারীলাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে:

"বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাত পূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। **মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ়তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।"**

ছন্দের ব্যাকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় ওস্তাদ তা যাঁরা তাঁর "ছন্দের হসন্ত হলন্ত" ('ছন্দ', পৃ ১১৬-১৫৮) পড়েছেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে সে ওস্তাদি-বিদ্যা প্রয়োগ করেন নি কারণ তিনি জানতেন—

"অন্ধের কান খুব সজাগ, ধ্বনির সঙ্কেতে সে চলতে পারে,—কবিরও সেই দশা। তা যদি না হোত তা হোলে পায়ে পায়ে কবিকে চোখে চশমা এঁটে অক্ষর গ'ণে গ'ণে চলতে হোত।" 'ছন্দ', পৃ ১২৩।

দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালে সচেতন পাঠক সহজেই অনুভব করবেন রবীন্দ্র-কাব্যের ছন্দ-বিবর্তন মানেই মর্মবিবর্তন। 'মানসী' দিয়েই আরম্ভ করা যাক—

১। দুরন্ত আশা

মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালো-মানুষ সেজে,
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে,
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে
খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে।

২। ক্ষণিক মিলন

একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে ভুলিয়া
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খুলিয়া।
জ্যোৎস্না অনিমিখ, চারিদিক সুবিজন,
চাহিল একবার আঁখি তার তুলিয়া।
দখিন বায়ুভরে থরথরে কাঁপে বন,
উঠিল প্রাণ মম তারি সুখ ভুলিয়া।

আবার ধীরে ধীরে গেল ফিরে আলসে,
আমার সব হিয়া মাড়াইয়া গেল সে।
আমার যাহা ছিল সব নিল আপনায়,
হরিল আমাদের আকাশের আলো সে।
সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়
তাহারি চরণের শরণের লালসে।

৩। নিষ্ফল কামনা

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।

অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

৪। মেঘদূত

অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত ; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট ; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি ; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে
বনস্পতি ; না জানি সে কোন্ নদীতীরে

যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি
ঘনঘটা ঊর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘ-পানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, "মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি !"

তারপর 'সোনার তরী'—

৫। হৃদয়-যমুনা

আজি বর্ষা গাঢ়তম নিবিড় কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি নূপুর রিনিকিঝিনি
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস ওগো এস, মোর
হৃদয় নীরে।

৬। ঝুলন

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ-খেলা
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা, গগন আঁধার
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার।
ভীষণ রঙ্গে ভবতরঙ্গে
ভাসাই ভেলা ;

বাহির হয়েছি স্বপ্নশয়ন
করিয়া হেলা,
রাত্রিবেলা।

৭। দেউল

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার।
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।

সবশেষে 'চিত্রা' থেকে একটি এবং 'বলাকা' থেকে একটি নমুনা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি :

৮। দুই বিঘা জমি

শুনি রাজা কহে, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা,—
ওটা দিতে হবে।" কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পাণি
সজল চক্ষে, "করুন রক্ষে গরিবের ভিটেখানি।
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে-মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে-মায়ে এমনি লক্ষীছাড়া!"

৯। হে বিরাটনদী

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

কবির আরও বহু ছন্দ-নিদর্শন এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে ; রবীন্দ্র-ছন্দ-মাহাত্ম্য বুঝতে হলে ছন্দের দিক থেকে সেগুলি বিচার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি

বিদ্যাসাগরী রীতির সঙ্গে আলালী রীতি মিশিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষাকে অবাধ গতি ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দান করেন রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর ছোট-গল্পগুলিতে সেই ভাষার সকল রকম সম্ভাবনা ও শক্তির পরীক্ষা করে সফলকাম হয়েছেন। গল্পগুলি ছাড়া তিনি যদি আর এক লাইন গদ্যও রচনা না করতেন তাহলেও তিনি মাস্টার অব বেঙ্গলি প্রোজ স্টাইল—বাংলা গদ্যশৈলীর ওস্তাদ বলে গণ্য হতেন। কৈশোরে লেখা তাঁর প্রথম গল্প "ভিখারিণী"তে (১২৮৪ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যায়) বঙ্কিমের অক্ষম অনুকরণ দিয়ে যে সাধনা শুরু করে-ছিলেন, সাত বছর যেতে না যেতে তাতে সিদ্ধিলাভ করে তাঁর নিজস্ব স্টাইল বা ভঙ্গি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ; ১২৯১ সালে "ঘাটের কথা" আর "রাজপথের কথা"য় সেই সিদ্ধির সূত্রপাত হয়ে ১২৯৮ সালেই 'হিতবাদী'র গল্প-গুলিতে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। তারপর ১৩২১ সালে 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব পর্যন্ত সেই একই ভাষা ও ভঙ্গির ক্রমবিকাশ আমরা দেখতে পাই। 'সবুজপত্র' থেকেই তাঁর ভঙ্গি হয়ে ওঠে মননধর্মী—ভাষা তীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত। আরও পরে একান্ত চলতি ভাষায় ক্ষুরধারব্যঙ্গপ্রধান ভঙ্গিতে তাঁর গল্পগুলি হয়ে ওঠে বিচিত্রতর। নেহাত গল্প বলা ছাড়াও আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও প্রাত্যহিক জীবনের নানাবিধ গোঁড়ামি ও অসঙ্গতির সংস্কারসাধনও তাঁর লক্ষ্য হয়ে ওঠে ; শিল্পীর নির্লিপ্ততা ব্যক্তি-ও-সমাজ-সচেতনতার দ্বারা খণ্ডিত

হয়। শেষোক্ত গল্পগুলি মননশীল সমাজের প্রিয় হলেও সর্বজনপ্রিয়তা অর্জন করে নি; ভাষাকে শাণিত ও মর্মান্তিক করবার জন্যে তাঁর এতাবৎ-ব্যবহৃত অন্বয়পদ্ধতির হেরফেরই তার কারণ।

রবীন্দ্রনাথ ভাল গল্প বলতে পেরেছেন, তার চাইতেও বড় কথা তিনি গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা ও ভঙ্গিরও পরিবর্তন করবার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। এই কারণে এখন পর্যন্ত পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁর কৈশোরের গল্পগুলি, বর্তমানে প্রচলিত তিন খণ্ড 'গল্পগুচ্ছে' ধৃত তাঁর চুয়াশিটি গল্প এবং শেষ বয়সের 'সে', 'গল্পসল্প' ও 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি মোটমাট প্রায় শতখানেক গল্প লিখলেও তিনি কোথাও একঘেয়ে হয়ে ওঠেন নি। এ বিপদ থেকে তাঁকে সবদা রক্ষা করেছে তাঁর প্রসন্ননির্মল হিউমারসৃষ্টির ক্ষমতা, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। অত্যন্ত কঠিন নির্মম বেদনাদায়ক বিষয়কে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করে তিনি পাঠকের সহনীয় করে তুলেছেন, অশ্রুসিক্ত অনাবিল ক্রন্দনকে পরিণত করেছেন চাপা দীর্ঘশ্বাসে। তাঁর অনেকগুলি গল্পের নায়ক-নায়িকার আত্ম-বিবৃতির ভঙ্গিও তাঁকে কম সাহায্য করে নি। নিছক অবিমিশ্র হাস্যরসও তিনি পরিবেশন করেছেন গল্পের মাধ্যমে, অনেকগুলিতে সামাজিক ও পারিবারিক বহু আধুনিক জটিল সমস্যার সমাধান করতে গিয়েও তিনি পাঠককে বিবিধ ভাবনার মধ্যে ফেলে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছেন। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়—তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ তাঁর কবিচিত্তের উচ্ছলিত কাব্যরস। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকবি, গল্প বলতে গিয়ে সেগুলিকে প্রয়োজনীয় স্থলে অপূর্ব কাব্যরসে মণ্ডিত করেছেন; নিসর্গলোকের ও মানুষের গহন অন্তর্লোকের খবর এমন সুনিপুণ সহৃদয়তার সঙ্গে দিয়েছেন যে পাঠকের সাধ্য নেই তার প্রভাব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। বাংলা ভাষার ওপর তাঁর অসাধারণ দখল এর জন্যে প্রধানতঃ দায়ী।

নানা রসজ্ঞ পণ্ডিত নানা দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন, আলোচনা প্রধানতঃ করা হয়েছে বিষয়বস্তুর দিক থেকে। কেউ বিচার করেছেন প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত মোটামুটি এই দু ভাগে গল্পগুলিকে ভাগ করে; কেউ করেছেন প্রেম, সমাজ-সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও অতিপ্রাকৃত এই চার ভাগে গল্পগুলিকে বিভক্ত করে; সমাজ-সচেতনতার দিক দিয়েও অনেকে গল্পগুলির বিচার করেছেন কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গির বিচিত্র পরীক্ষাই যে তাঁকে নবনব গল্প প্রণয়নে প্রবৃত্ত করেছে, গল্পগুলি ভাল করে পড়লে তা বুঝতে দেরি হয় না। মানব-চরিত্রকে উপাদান করে বাস্তব ও অবাস্তবের অপূর্ব খেলা খেলেছেন কবি এবং ভাষার ঐন্দ্রজালিক রবীন্দ্রনাথ। যেখানে যেমনটি প্রয়োজন তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সেখানে ঠিক তেমনটি হয়ে উঠেছে—কোথাও তীক্ষ্ণ, কোথাও গুরুগম্ভীর, কোথাও লঘু, কোথাও হাস্যমুখর। রহস্যকে ঘনীভূত করে তোলবার জন্যে অতিপ্রাকৃত গল্পের বর্ণনাভঙ্গি একরকম, আবার প্রকৃতির পরিবেশকে মধুর অথবা ভয়ঙ্কর করে তোলবার জন্যে ভঙ্গি অন্যরকম। মানুষে মানুষে অতি সূক্ষ্ম বিরোধ মর্মান্তিক ব্যঙ্গে হয়ে উঠেছে স্পষ্ট, ভালবাসার নিবিড় আবেগ লঘু হাসিতে হয়েছে মনোরম। আর একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রথম প্রকাশের বাহনগুলির ধারা অনুযায়ী তাঁর নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভা তাঁর গল্পগুলির ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে; অর্থাৎ 'ভারতী'র গোড়ার দিকে তিনি পূর্বগামীদের অনুকরণে হাত-মক্শ করে 'হিতবাদী'তে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন, 'সাধনা'য় লাভ করেছেন সিদ্ধি এবং 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে' তাঁর গল্প পরিপক্ক ও গাঢবদ্ধ হয়ে উঠেছে। সবশেষে 'সবুজপত্রে' দেখিয়েছেন পাকা ওস্তাদের নিপুণ তরবারির খেলা। একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে কয়েকটি সাময়িক পত্রকে আশ্রয় করে যে গল্পগুলি রচিত হয়েছে সেগুলিকে সিদ্ধ সাধকের খেয়াল-খুশীর খেলা বললে দোষ হবে না। দৃষ্টান্ত ছাড়া ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য দেখানো সম্ভব নয়।

প্রথমেই "পোস্টমাস্টার" গল্পটি ধরা যাক। খাস কলকাতার মানুষ এলেন অজ পাড়াগাঁ উলাপুরের পোস্টমাস্টার হয়ে। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যে অবস্থা হয় তাঁর সেই অবস্থা হল। নিবান্ধব জীবনকে কতকটা সুসহ করল ঝি রতন, গাঁয়েরই একটি বারো-তেরো বছরের অনাথা মেয়ে। সে কাজকর্ম করে, ফাই-ফরমাশ খাটে, বিনিময়ে খেতে পায়। অসুখে পড়লেন পোস্টমাস্টার। সহজ সেবার দ্বারা তাঁকে সুস্থ করল রতন, মনিবে-ঝিয়ে একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হল। তারপর হঠাৎ এল বদলির হুকুম। পোস্টমাস্টার শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ; পৃথিবীতে-কে-কার-গোছ একটা দার্শনিক তত্ত্ব মনে মনে খাড়া করে এই আকস্মিক বিচ্ছেদ বরদাস্ত করলেন কিন্তু অশিক্ষিতা রতন? রবীন্দ্রনাথ তারই কথা দিয়ে গল্পটি এইভাবে শেষ করেছেন—

"কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্টআপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।"

একটা সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে শাশ্বত মর্যাদা দিয়েছে এই সহৃদয় বর্ণনাটুকু, অতিসাধারণ দুটি মানুষের সাময়িক সুখদুঃখের কাহিনীকে চিরন্তনের গৌরব দিয়ে করে তুলেছে বিশ্বের গল্পসাহিত্যের সম্পদ।

তেমনি "অতিথি" গল্পে মানুষের সুখদুঃখে প্রকৃতির নিষ্ঠুর নির্মমতার বর্ণনাটুকু শেষে যুক্ত না হলে এ গল্পের ভারসাম্য রক্ষা হত না, এটি একটি উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠত না। বর্ণনাটুকু এই :

"দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খলখল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুটিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা

আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারি কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ব এবং পাতায় ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।"

মানবীয় সম্পর্কের বা সম্পর্ক-বিচ্ছেদের অতিসূক্ষ্ম ও মর্মান্তিক ঘাত-প্রতিঘাত-মূলক গল্পগুলি একটু বিস্তৃততর উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। "শাস্তি" গল্পের শেষ পংক্তি—"চন্দরা কহিল 'মরণ'!—"

এর সম্পূর্ণ ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে গেলে সম্পূর্ণ গল্পটির ভাব ও ভাষা অনুধাবন করতে হবে, তবেই বুঝতে পারা যাবে ওই "মরণ" শব্দটির মধ্যে কী সুগভীর ঘৃণা ও প্রচণ্ড ধিক্কার লুকিয়ে আছে; যার থেকে মুক্তি একমাত্র মরণই দিতে পারে।

"সম্পাদক" গল্পের সামান্য একটা দেশলায়ের কাঠির উপমার মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনে গর্বিত সন্তানবিস্মৃত পিতার যে ছবিটি ফুটেছে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি ও শব্দ-কৌশল-মহিমা আশ্চর্যরকম প্রকাশ পেয়েছে—

"হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশলায়ের কাঠি; মিনিট খানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।...ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা [মাতৃহারা কন্যা] বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।...পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম।"

আমরা, পাঠকরা, একটা আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই আশ্বাস লাভ করলাম—সম্পাদক আবার স্নেহময় পিতার ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতময় ভাষা ও অপূর্ব বর্ণনা বরীচের সামান্য তুলার মাশুল কলেক্টরের ("ক্ষুধিত পাষাণ") মত অতিসাধারণ মানুষকেও যে কোন্ অজ্ঞাত

নিষিদ্ধ স্বপ্নরাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করতে পারে তারই প্রমাণ নীচের কয়েকটি লাইনে মিলবে—

"আবার সেইদিন অর্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, 'তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা, নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের উপর দিয়া, নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও। আমাকে উদ্ধার করো।'

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণমান পরিবর্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে।..."

কবির ভাষার জাদুতে পাঠকের চিত্তও তখন হাহাকার করে ওঠে—"আমি কে, আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব।"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কাব্যধর্ম

রবীন্দ্রনাথ অতি শৈশবেই কবিতা লেখা আরম্ভ করেছিলেন, বলা যেতে পারে কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত কবিতা তাঁর সহজাত। কিন্তু ছোটগল্প, উপন্যাস, সাহিত্যসমালোচনা, গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হতে খুব দেরি হয় নি—এর সকলগুলিতেই তিনি হাত দিয়েছেন কৈশোরেই। ছোটগল্প সম্পর্কে আরও পাকা হিসেব দাখিল করতে হলে বলতে হবে—ছাপার হরফে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাশিত 'ভারতী'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর প্রথম ছোটগল্প "ভিখারিণী" বের হয়—ইংরেজী ১৮৭৭ সন জুলাই-আগস্ট দু মাসে। তাঁর

বয়স তখন ষোল। বয়সধর্মে স্বভাবতঃই এ লেখা অনুকরণ, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণ।

তার পরেই দেখতে পাই ১২৯১ বঙ্গাব্দে তিনি পর পর "ঘাটের কথা" ও "রাজপথের কথা" লিখেছেন এবং এই ছোটগল্প দুটির মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য—গীতিকাব্য-প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি—লিরিক পোয়েট। গল্পের বিষয়বস্তুর বা বস্তুতন্ত্রতার চেয়ে কাব্য-ধর্ম স্বভাবতঃই প্রবল হবার কথা। 'গল্পগুচ্ছে' ধৃত তাঁর গোড়ার গল্প দুটি এবং প্রায় শেষের 'লিপিকা'-ভুক্ত কথিকাগুলি লিরিকাল কাব্যধর্মে ওতপ্রোত।

মাঝখানের ছোটগল্পগুলি এবং সবশেষের 'তিন সঙ্গী' বাস্তব ও কল্পনার সমান সংমিশ্রণে রচিত। এর মধ্যে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান কতখানি এবং কবি-কল্পনা কতখানি, তা অনুমান করা সহজসাধ্য নয়। একজন বিখ্যাত সমালোচক এই যুগের ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথকে ঐন্দ্রজালিক বলেছেন। তিনি কল্পনাকে বাস্তবে এমন ভাবে রূপান্তরিত করেছেন যে, পাঠকের সাধ্য নেই ধরেন বাস্তবে কতখানি কল্পনার খাদ মিশেছে। এ বিষয়ে তাঁর "ভাষা ও ছন্দে" নারদের মুখে তাঁরই মনের কথা আমরা শুনতে পাই—

"সেই সত্য, যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

১২৯৮ বঙ্গাব্দই হচ্ছে তাঁর ছোটগল্প রচনার সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধির কাল। এই বছরে তিনি মনীষী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য-সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক হন এবং হিতবাদীর প্রথম ছয় সংখ্যায় তাঁর ছটি গল্প বের হয়—"দেনাপাওনা," "গিন্নী," "পোষ্টমাষ্টার," "তারাপ্রসন্নের কীর্ত্তি", "ব্যবধান" এবং "রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা"। বছরের শেষের দিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটলেও গল্প লেখা সমান বেগে চলতে থাকে, 'হিতবাদী'তে প্রকাশ অবিচ্ছিন্ন হয় না। "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন", "সম্পত্তি সমর্পণ", "দালিয়া", "কঙ্কাল", "মুক্তির উপায়" এই বছরেরই লেখা। আমরা হিসেব করে দেখতে পাচ্ছি এই সময় কবি তাঁদের জমিদারী দেখবার ভার পেয়েছিলেন এবং নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-রাজসাহী-পাবনা জেলার নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিতে গরুর গাড়ি ও নৌকাযোগে খুবই ঘোরাফেরা করেছেন। কলকাতার কোটরবাস ছেড়ে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে শুধু নয়, মানুষের সঙ্গেও

তাঁর মাখামাখি হয়েছে, এবং বাস্তবের ভিত্তির ওপর তাঁর আকাশ-কল্পনাশ্রয়ী মন গল্পের পর গল্প রচনা করে গেছে। কোন্ আবেগ অনুভূতি বা কাব্যধর্ম এই রচনাগুলির অন্তরালে কাজ করেছিল তা আমরা ১২৯৯ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ লেখা একটি কবিতায় এই ভাবে পাই :

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ, ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,
সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি না জানি কেমন করে হিয়া!
লয়ে পুঁথি দু-চারিটি নেড়েচেড়ে ইটি সিটি এই মতো কাটে দিনরাত।
তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই উলটি পালটি দেখি পাত;—
কোথা রে বর্ষার ছায়া অন্ধকার মেঘমায়া ঝর ঝর ধ্বনি অহরহ,
কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনলীন জীবনের নিগূঢ় বিরহ।
বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পূরে সংগীতের মুষলধারায়
পরাণের বহু দূর কূলে কূলে ভরপুর—বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।
তখন সে পুঁথি ফেলি, দুয়ারে আসন মেলি বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।

—এই হচ্ছে ছোটগল্প লেখার প্রকৃষ্ট পরিবেশ, স্বপ্ন-জাগরণে মেশা এই মেঘান্ধকার নিশীথে, অবিরাম ঝর ঝর বারিপতনের মধ্যে। কলকাতা থেকে দূরে নদীপ্লাবিত পল্লী-প্রকৃতির স্নেহছায়ায় হলে আরো ভালো।

মাথাটি করিয়া নীচু বসে বসে রচি কিছু বহু যত্নে সারাদিন ধরে,
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত গল্প লিখি একেকটি করে।

কি রকম গল্প?

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ-কথা নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধূলা কত ভাব, কত ভয় ভুল

সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি ঝর ঝর বরষার মতো—
ক্ষণ অশ্রু ক্ষণ হাসি পড়িতেছে রাশিরাশি শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা নিমিষের লীলাখেলা চারিদিকে করি স্তূপাকার
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ মোটমাট প্রায় শতখানেক গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে চুরাশিটি তাঁর বর্তমান প্রচলিত তিনখণ্ড 'গল্পগুচ্ছে' আছে। এগুলির অধিকাংশের প্রেরণা তাঁর অসাধারণ কাব্যানুভূতি। অনেক সময় গল্প লিখতে লিখতে তিনি আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন—বড় বেশি কাব্য হয়ে যাচ্ছে, তখনই নিতান্ত আকস্মিকভাবে বাস্তবতার লগুড় হেনে কাব্য-পরিবেশটাকে একটু নাড়া দিয়েছেন, তাঁর মজ্জাগত কাব্যধর্মকে হার মানাতে চেয়েছেন যুক্তির কাছে, বিজ্ঞানের কাছে। যেমন, "ক্ষুধিত পাষাণ", "মণিহারা", "কঙ্কাল" প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা সফল হয় নি, শেষাশেষি পাঠকের মনে কাব্যানুভূতিরই রেশ থেকে যায়। কাব্যধর্মের সোহাগায় মণ্ডিত হয়ে তাঁর গল্পের সোনা সকল ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প-লিখিয়ে যাঁরা—এডগার অ্যালেন পো, গীদে মোপাসাঁ, অ্যান্টন শেখভ প্রভৃতির সঙ্গে একাসনে বসবার অধিকার তিনি পেয়েছেন। প্রত্যেকটি গল্পের অন্তর্নিহিত এই কাব্যধর্ম, সমগ্র গল্পটি পড়ে বিশ্লেষণ করে না দেখালে বোঝানো যাবে না। না গেলেও তাঁর কয়েকটি গল্পের ভাষাগত সৌন্দর্য—সঙ্গীত-মাধুরী থেকে তার পরিচয় মিলবে। আমি কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। প্রথম গল্প "ঘাটের কথা" দিয়েই শুরু করি। ঘাট বলছে—

"এই যে অশ্বত্থ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে "রাজপথের কথা"—

"আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য-

পর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশ-দেশান্তর বেষ্টন করিয়া, বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধূলায় লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্তও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি ; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ। কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে।"

'নিশীথে'র দক্ষিণাচরণের উক্তি :—

"এমনসময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল ; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল ; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল…এবং সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার বলিতে পারি না।"

"মণিহারা" গল্পে অন্ধকারের গাঢ়তার সঙ্গে মৃত্যুর রহস্তকে ঘনীভূত করে তোলা—

"এমনসময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্‌ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল।

প্রকৃতি নিশীথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথি-সমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরও একটা বেশি করিয়া পর্দা ফেলিয়া দিল।"

"মহামায়া" গল্পের সেই অপূর্ব বর্ণনা—

"মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট এক-একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্তস্বর-সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল। মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুল গাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর সর শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্ ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটা রাখালের বাঁশিতে মেঠোসুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।"

এবং "দুরাশা"য় বদ্রাওনের নবাব-পুত্রীর সেই হৃদয়বিদারক আর্তনাদ :—

"আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে জোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোকপুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড়-নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল, সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে এক-বাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্যসুন্দর শান্তশীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল।"

এই ভাষা, এই ছন্দ, এই কাব্যপ্রবাহ গল্পপিপাসু বাঙালীচিত্তকেও টেনে

নিয়ে গেছে নব নব সৌন্দর্যের দেশে এবং এই কাব্যধর্মের জোরে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পৃথিবীতে অনন্যসাধারণ হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমস্ত পৃথিবী প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী হয়ে এসেছে দুঃখ-দৈন্য-কর্মময় জীবনে আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা লাভের জন্যে. ভারতবর্ষের বাণীকে চিরদিনই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে বহিঃপৃথিবী। মধ্যে দীর্ঘকাল পরাধীনতার লাঞ্ছনার মধ্যে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হয়েছিল ভারতের চিরন্তন বাণী—ঐক্যের সাম্যের একের বাণী। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতবর্ষের কয়েকজন অধ্যাত্ম-বল-সম্পন্ন কৃতী সন্তান পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও নিখিল বিশ্বকে শুনিয়ে গেছেন ভারতের মর্মকথা। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ নতুন যোগাযোগের পথ প্রশস্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল প্রতিভা এবং ঐশী কবিশক্তির বলে সেই পথেই ভারতবর্ষের নিভৃত-তপোবনের সাধনালব্ধ বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্ববাসীর অন্তরে তিনিই ভারতবর্ষের বাণীরূপটি তুলে ধরে ভারতবর্ষের লুপ্ত মহিমাকে নবজাগ্রত করবার গৌরব লাভ করেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার চরমশক্তিতে শক্তিমান মদমত্ত পশ্চিম অবাধ পীড়ন-শোষণের মধ্যেই তাঁরই জন্যে সচেতন হয়ে উঠেছে ভারত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে। আমেরিকার দার্শনিক মনীষী উইল ডুরাণ্টকে স্বীকার করতে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের মত লোক ভারতবর্ষে জন্মেছেন শুধু এই কারণেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর শেষ জীবনের আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে একা রবীন্দ্রনাথই ভারতবর্ষের বাণীবাহক রূপে সমস্ত পৃথিবীকে নতুন করে আকর্ষণ করেছিলেন ভারতের দিকে, উন্মুখ করে তুলেছিলেন বিশ্বচিত্তকে।

বিশ্বশান্তির জন্যে ভারতের মহান আদর্শের যে প্রয়োজন আছে এই বোধ রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম জাগ্রত হয় বুওর যুদ্ধে ইংলণ্ডের সর্বগ্রাসী অভিযান আরম্ভ হওয়ার পরে। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে তার পরিচয় আছে। পশ্চিমের ঐশ্বর্যের মোহে পথভ্রান্ত ভারতবর্ষকে সাবধান করে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শকে তিনি তুলে ধরে দেখিয়েছিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি শুনিয়েছিলেন—

কোরো না কোরো না লজ্জা, হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই বণিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষ সম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সরল জীবনখানি করিতে বহন।

শুনো না কী বলে তারা, তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক তাহা ঘরে,
থাক তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের 'পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত্ত।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্র বেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।
আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধিরপুষ্ট বিলাসলালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ,
সুবিরল—নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ।
কে রাখিবে ভরি নিজ অনন্ত-আগার
আত্মার সম্পদ রাশি মঙ্গল উদার।

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারায়ে।
তাই মোরা লজ্জানত, তাই সর্ব গায়ে
ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন,
তাই আজি ব্রাহ্মণের বিরল বসন
সম্মান বহে না আর, নাহি ধ্যানবল
শুধু জপমাত্র আছে, শুচিত্ব কেবল
চিত্তহীন অর্থহীন অভ্যস্ত আচার,
সন্তোষের অন্তরেতে বীর্য নাহি আর,
কেবল জড়ত্বপুঞ্জ, ধর্ম প্রাণহীন
ভারসম চেপে আছে আড়ষ্ট কঠিন।
তাই আজি দলে দলে চাই ছুটিবারে
পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র লুটিবারে
লুকাতে প্রাচীন দৈন্য। বৃথা চেষ্টা, ভাই,
সব সজ্জা লজ্জাভরা, চিত্ত যেথা নাই।

এর কিছুকাল পরেই স্বদেশী আন্দোলনের নবজাগরণের মধ্যে কবি সনাতন ভারতবর্ষের মহিমা সম্বন্ধে আরও সচেতন, আরও দৃঢ় হয়ে ঘোষণা করলেন—

"ভারতবর্ষ তাহার তপ্তাতাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্কধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে।…নিস্তব্ধতার এই ভীষণ শক্তি ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো সঞ্চিত হইয়া আছে; আমরা নিজেই ইহাকে জানি না। দারিদ্র্যের যে কঠিন বল, মৌনের যে স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার যে কঠোর শান্তি এবং বৈরাগ্যের যে উদার গাম্ভীর্য, তাহা আমরা কয়েকজন শিক্ষাচঞ্চল যুবক বিলাসে, অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে, এখনো ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারি নাই। সংযমের দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা এই মৃত্যুভয়-হীন আত্মসমাহিত শক্তি ভারতবর্ষের মুখশ্রীতে মৃদুতা এবং মজ্জার মধ্যে কাঠিন্য, লোকব্যবহারে কোমলতা এবং স্বধর্মরক্ষায় দৃঢ়ত্ব দান করিয়াছে। শান্তির মর্মগত এই বিপুল শক্তিকে অনুভব করিতে হইবে, স্তব্ধতার আধারভূত এই প্রকাণ্ড কাঠিন্যকে জানিতে হইবে। বহু দুর্গতির মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত এই স্থির শক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, এবং সময়কালে এই দীনহীনবেশী ভূষণহীন বাক্যহীন নিষ্ঠাদ্রঢ়িষ্ঠ শক্তিই জাগ্রত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে আপন বরাভয়হস্ত প্রসারিত করিবে,… আজিকার দিনের বহু আড়ম্বর, আস্ফালন, করতালি, মিথ্যাবাক্য, যাহা আমাদের স্বরচিত, যাহাকে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা একমাত্র সত্য, একমাত্র বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছি, যাহা মুখর, যাহা চঞ্চল, যাহা উদ্বেলিত পশ্চিমসমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেনরাশি—তাহা, যদি কখনো ঝড় আসে, দশদিকে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তখন দেখিব, ঐ অবিচলিতশক্তি সন্ন্যাসীর দীপ্তচক্ষু দুর্যোগের মধ্যে জ্বলিতেছে, তাহার পিঙ্গল জটাজূট ঝঞ্ঝার মধ্যে কম্পিত হইতেছে,—যখন ঝড়ের গর্জনে অতিবিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বক্তৃতা আর শুনা যাইবে না, তখন ঐ সন্ন্যাসীর কঠিন দক্ষিণ বাহুর লৌহবলয়ের সঙ্গে তাহার লৌহদণ্ডের ঘর্ষণঝংকার সমস্ত মেঘমন্দ্রের উপরে শব্দিত হইয়া উঠিবে। এই সঙ্গহীন নিভৃতবাসী ভারতবর্ষকে আমরা জানিব, যাহা স্তব্ধ—তাহাকে উপেক্ষা করিব না, যাহা মৌন—তাহাকে অবিশ্বাস করিব না,—যাহা বিদেশের বিপুল বিলাসসামগ্রীকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অবজ্ঞা করে, তাহাকে দরিদ্র বলিয়া

উপেক্ষা করিব না ; করজোড়ে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিব, এবং নিঃশব্দে তাহার পদধুলি মাথায় তুলিয়া স্তব্ধভাবে গৃহে আসিয়া চিন্তা করিব।"

তাঁর বিশ্বদেবতাকে সম্বোধন করে যে মহাবাণীর কথা বললেন—

ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি বণিকের ধনঝঙ্কার
মহাকাশ তলে ওঠে ওঙ্কার
কোনো বাধা নাহি মানি।

ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে,
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সঙ্গীত-তানে শূন্যে উথলে
অপূর্ব মহাবাণী।

সেই মহাবাণীর বাহক হয়েই রবীন্দ্রনাথ অভিযান করলেন পশ্চিমে। ভারতের বিস্মৃত মহিমাকে আবার তুলে ধরলেন সমস্ত পৃথিবীর সামনে। তিনি ইউরোপের সমস্ত দেশে আমেরিকায় চীনে জাপানে পূর্ব-দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে ভ্রমণ করে নানা বৈঠক ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে এই ভারতবর্ষেরই পরিচয় ঘটিয়েছেন সেই সেই দেশের সঙ্গে ; পুরাতন ছিন্ন যোগসূত্র আবার জোড়া লাগাতে চেয়েছেন প্রাচ্য ভূখণ্ডে, নতুন যোগসূত্র রচনা করেছেন পশ্চিমে। তাঁর 'সাধনা', 'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি', 'ন্যাশনালিজম' প্রভৃতি পুস্তকের অন্তর্গত নিবন্ধগুলির মধ্যে আমরা সনাতন ভারতের তপোবনের বাণীই নতুন ভাবে শুনতে পাই, শুনতে পাই মৈত্রীর ও প্রেমের ব্যাকুল আহ্বান। এই বাণী শুনতে শুনতে সচকিত হয়ে ওঠে জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য জগৎ এবং পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণপন্থী প্রাচ্য মহাদেশ। ভারতের কবি ভারতের বাণী প্রচার করেই বিশ্বকবির সর্বোচ্চ আসন অধিকার করেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে বিভ্রান্ত পৃথিবীতে কবির কণ্ঠে এই কথাই ধ্বনিত হয়—

এ দুখ বহন করো মোর মন
শোনো রে একের ডাক,
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক্।
* *

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

তাঁর লেখনীমুখে ফুটে ওঠে শাশ্বত ভারতের রূপ, সে রূপ স্বার্থের দ্বারা কলঙ্কিত নয়, ভেদের দ্বারা খণ্ডিত নয়, কলহের দ্বারা কণ্টকিত নয়। সমস্ত পৃথিবীতে এই বার্তাই ছড়িয়ে পড়ে :

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন

করা, নানা পথকে একই লক্ষ্য অভিমুখীন করে দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাকে নষ্ট না করে তার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তার এই স্বভাবই তাকে চিরদিন রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন করেছে। কারণ রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে বিরোধের ভাব। ইউরোপীয় সভ্যতার ঐক্যের মধ্যে যে বিরোধের ফাঁস রয়েছে তাকে পরের বিরুদ্ধে টেনে রাখা যায়, কিন্তু তাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এই জন্য তা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে রাজায় প্রজায় ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করে রেখেছে। ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছে। বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টেনে এনেছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরে বিচিত্র উপকরণে তার ভিত্তি নির্মাণ করে এসেছে। পর বলে সে কাকেও দূর করে নি, অনার্য বলে সে কাকেও বহিষ্কৃত করে নি, অসঙ্গত বলে সে কিছুই উপহাস করে নি। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করেছে। সমস্তই স্বীকার করেছে। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করে নিয়েছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নি এবং গ্রহণ করে সকলই আপনার করেছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবহারে নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি, গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করবার আদর্শরূপে বিরাজ করছে, তার ইতিহাস থেকে এই-ই প্রতিপন্ন হবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করে সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ তাই করেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে যখন ভারতবর্ষ সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করবে তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে।…

রবীন্দ্রনাথ নিজে ভারতবর্ষের এই বাণীকে জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করেছেন, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করেছেন।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরেই ১৯১৫ সনের শেষে একমাত্র তিনিই জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন—

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে,
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

১৯৪১, ৭ই আগস্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর, ২৭ আগস্ট দেরাদুন- জিলাজেল থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে একটি পত্রে যে চিরস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন তা সবশেষে উদ্ধৃত করছি :

I have met many big people in various parts of the world. But I have no doubt in my mind that the two biggest I have had the privilege of meeting have been Gandhi and Tagore. I think they have been the two outstanding personalities in the world during the last quarter of a century. As time goes by, I am sure this will be recognised, when all the generals and field marshals and dictators and shouting politicians are long dead and largely forgotten.

It amazes me that India inspite of her present condition (or is it because of it ?) should produce these two mighty men in the course of one generation. And that also convinces me of the deep vitality of India and I am filled with hope, and the petty troubles and conflicts of the day seem very trivial and unimportant before this astonishing fact—the continuity of the idea that is India from long ages past to the present day. China affects me in the same way. India and China : how can they perish ?

There is another aspect which continually surprises me. Both Gurudeva and Gandhiji took much from the west and from other countries, especially Gurudeva. Neither was narrowly national. Their message was for the world. And yet both were 100% India's children, and the inheritors, representatives and expositors of her age-long culture. How intensely Indian both have been, in spite of all their wide knowledge and culture ! The surprising thing is that both of these men with so much in common and drawing inspiration from the same wells of wisdom and thought and culture, should differ from each other so greatly ! No two persons could probably differ so much as Gandhi and Tagore !

Again I think of the richness of India's age-long cultural genius which can throw up in the same generation two such master-types, typical of her in every way, yet representing different aspects of her many-sided personality.

রবীন্দ্র-সাহিত্য যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করি তা হলে তার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাব শাশ্বত ভারতবর্ষকে—শুনতে পাব ভারতের চিরন্তন বাণী।

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

১৩৪৬ কার্তিক-চৈত্র, ১৯৩৯ অক্টোবর-১৯৪০ মার্চ 'শনিবারের চিঠি' হইতে পুনর্মুদ্রণ। সংশোধন, সংযোজন ও টীকা যোজিত হইয়াছে।]

[১৯২২ সনে যখন কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩২৮) শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখিত "রবীন্দ্র-পরিচয়" পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরের রচনা সম্পর্কে প্রথম অবহিত হই। বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকদের দৃষ্টি সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম প্রশান্তচন্দ্রই এইদিকে আকৃষ্ট করেন। আমার কৌতূহল তখনই জাগ্রত হয়। অসম্পূর্ণ "রবীন্দ্র-পরিচয়ে" মাত্র কয়েকটি অনামী লেখার উল্লেখ ছিল তবে লেখক এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনামী রচনাগুলিতে স্বয়ং কবিকে দিয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। সে-তালিকা সম্ভবতঃ প্রশান্তচন্দ্র আর সাধারণের গোচরে আনেন নাই। আনিলেও তাহা আমার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। দীর্ঘ সতের বৎসর পরে ১৯৩৯ সনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পাই। তাঁহার বাল্য-কৈশোরের বেনামী ও অনামী রচনাগুলি সম্পর্কে পূর্বেকার কৌতূহল পুনরায় জাগ্রত হয় এবং আমি স্বয়ং অনুসন্ধান ও গবেষণা আরম্ভ করি। কবিকে যখন যা প্রশ্ন করি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়া তিনি আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করেন। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উৎসাহিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিতে থাকেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের 'শনিবারের চিঠি'র কার্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ছয় মাস সম্মিলিতভাবে আমার রচনাপঞ্জী ও ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয় এবং অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ হইয়া যায়। ১৩৪৮ আশ্বিন রবীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী বাহির হয় এবং আমার রচনাপঞ্জীও পুনরায় আরম্ভ করি। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৪৯ সালের ২রা পৌষ পুস্তকাকারে 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' প্রকাশ করেন। তাহার "ভূমিকা"য় আমি লিখি:

"কিছু কাল পূর্বে (রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি ধারাবাহিকভাবে 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকের রচনা ও গ্রন্থের একটি পঞ্জী প্রকাশ করিয়াছিলাম; **ব্রজেন্দ্রবাবু মুদ্রিত গ্রন্থগুলি লইয়া এবং আমি তাঁহার বিভিন্ন বেনামী ও ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনাগুলি লইয়া কাজ করিয়াছিলাম।** প্রভাত-বাবু এবং প্রশান্তবাবুর তৎপূর্বে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্রের প্রবন্ধাদির সাহায্য সত্ত্বেও এই গ্রন্থপঞ্জীর কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যে কত দুরূহ,

সেই সময়েই তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের পরিশ্রমের বহর দেখিয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই রচনা ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের কাজ নানা কারণে 'শনিবারের চিঠি'তে সম্পূর্ণ হয় নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু যে এতদিনে কঠিন পরিশ্রমসহকারে গ্রন্থপঞ্জীর কাজ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলেন, সেই আনন্দেই আমি আজ এই ভূমিকা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি।...এই গ্রন্থ দৃষ্টে রবীন্দ্রনাথের বেনামী ও ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনাপঞ্জীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করিবার আগ্রহ আমার হইতেছে।"

নানা কারণে রচনাপঞ্জীর কাজ আর বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। তবে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে যেটুকু পরিশ্রম আমি করিয়াছি পরবর্তী রবীন্দ্র-গবেষকগণ তদ্দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও অনেকের কাজে লাগিবে এই আশায় রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী এই গ্রন্থভুক্ত করিলাম।

'শনিবারের চিঠি'তে রচনাপঞ্জী-প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত সংগ্রহ'-প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রজেন্দ্রনাথ ও আমার উপর ন্যস্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বিচলিত হন। তিনি এক পত্রাঘাত করিয়া জানান—

"বিশ্বভারতী-গ্রন্থপ্রকাশ মণ্ডলী আমার সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী বলতে বোঝায় অনেকখানি অংশ যা প্রাগৈতিহাসিক। যার সঙ্গে আমার সাহিত্য-ইতিহাসের দূরবর্তী যোগ আছে কিন্তু তার চলতি কারবার বন্ধ হয়ে গেছে। অতীতের ঘষে-যাওয়া-তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্ত-যুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করবে বসে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না। কারণ যে বাণীর শিল্প-আবরণ গেছে জীর্ণ হয়ে, সাহিত্যের দরবারে তার প্রবেশ করবার মতো আব্রু নেই।"

কিছুকাল পূর্বে কবি একটি ব্যঙ্গ-কবিতায় পুরাতনে-উৎসাহী সঙ্কলকদের পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা ;—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি'।......

সৃষ্টির কাজ লুপ্তির সাথে চলে,
ছাপাযন্ত্রের ষড়যন্ত্রের ফলে
এ বিধান যদি পদে পদে পায় বাধা
জীর্ণ ছিন্ন মলিনের সাথে গোঁজা
কৃপণ পাড়ার রাশীকৃত নিয়ে বোঝা
সাহিত্য হবে শুধু কি ধোবার গাধা।"

কবিকে গিয়া বলিলাম, এ আপনার অন্যায় গালি। টম-ডিক-হ্যারি বা রাম-শ্যাম-যদুর নীল কাগজের খাতা ও লেটস ডাইরি লইয়া তাহাদের নিতান্ত আপনার জন ছাড়া কোনও মানুষই মাথা ঘামাইবে না কিন্তু উইলিয়াম শেক্সপীয়ার বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খাতা ও ডাইরির খোঁজ পৃথিবীর সব মানুষই করিবে। নিছক ঐতিহাসিক কৌতূহল ইহা নয়। কবি জীবনের ধারাবাহিক সাধনার ইতিহাস কাব্যোপলব্ধির পক্ষেও সহায়ক।

মোগলের হাতে পড়িয়া খানা খাইবার মত, কতকটা অসহায় ভাবেই কবি বিশ্বভারতীগ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে তাঁহার "ভূমিকা"-শেষে লিখিলেন :

"প্রকৃতির সৃষ্টিতে যা ত্যাজ্য, প্রবল তার সম্মার্জনী। মানুষের রচনার ক্ষেত্রেও আছে সম্মার্জনী, সেটা ঝেঁটিয়ে ফিরিয়েও আনে। তার প্রভাব মানতেই হবে। প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয় নি তারও মূল্য আছে হয় তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে; তাই সাহিত্যের অবজ্ঞা এড়িয়েও সে প্রকাশকের পাসপোর্ট পেয়ে থাকে।"

"অচলিত-সংগ্রহ" দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ১ম ও ২য় খণ্ডে কবির যাবতীয় মুদ্রিত অথচ প্রচলিত রচনাবলীতে বর্জিত গ্রন্থ স্থান পায়। পরবর্তী খণ্ডে সাময়িকপত্রে বা অন্যত্র প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত রচনাগুলি ছাপিবার কথা ছিল কিন্তু এতাবৎকাল সে কাজে অগ্রসর হওয়া যায় নাই। এই কারণেই "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"র কাজও ফুরায় নাই। এই পঞ্জীতে শুধু রচনার তালিকাই যথেষ্ট নয়—এই গুলির মূল্য বুঝাইবার জন্য ইহাদের পরিচয় ও স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে তাহাই দেওয়া হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে শুধু অ-নামী ও বে-নামী রচনাই আমার আলোচনার বিষয়।]

কোর্ট উইলিয়ম কলেজের বস্তাপচা পুরাতনকে লইয়া কারবার করি বলিয়া আমাদের অপবাদ রটিয়াছে। প্রধানতঃ এই অপবাদ ক্ষালনের জন্য এবং বিশেষ করিয়া 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'-সম্পাদকদের সামান্য সহায়তার জন্য পুরাতনের পুরাতন এবং নূতনের নূতন রবীন্দ্রনাথকে লইয়া পড়িয়াছি। কাজ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, কোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের জীবনী ও রচনাপঞ্জী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া সত্য নির্ধারণ করা বরং সহজ। রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জীর মত এমন জটিল অরণ্য তাপপ্রধান ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি নাই; এই লতাগুল্ম এবং বনস্পতিসঙ্কুল অরণ্যপ্রদেশে একবার প্রবেশ করিলে দিশা হারাইবেন না, এমন কৌশলী সন্তানের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'ও উল্লিখিত নাই, স্বয়ং ভবানী পাঠকও এখানে ঘায়েল হইবেন। তথাপি পূর্বগামীদের প্রাণান্তকর চেষ্টায় ক্ষীণ পথ এবং পদচিহ্ন এখানে ওখানে অঙ্কিত হইয়াছে; তাহারই সূত্র ধরিয়া বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির অভ্যন্তরে সূত্রের মত অগ্রসর হইতেছি। এই পূর্বগামীদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি, তিনি শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে গবেষণা এবং কিংবদন্তী মিশাইয়া স্খলন পতন এবং বিস্মরণ সত্ত্বেও তিনি যে 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ পাঠকের তাহাই একপ্রকার আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া আছে। শুনিয়াছি, রবীন্দ্র-সাহিত্যের জটিলতর সকল অলিগলির খবর রাখেন, এমন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমানে জীবিত আছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে তাঁহারা প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতই নীরব। 'জীবন-স্মৃতি'তে এক অপূর্ব ভোজের স্বাদমাত্র দিয়া রবীন্দ্রনাথ হাত গুটাইয়া লইয়াছেন; বহুদিন পর্যন্ত বাংলা দেশের সকল পাঠকই ব্যাকুল আগ্রহে সেই মহাভোজের প্রতীক্ষায় ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, রবীন্দ্রনাথ আর তাঁহার খোলের বাহিরে আসিলেন না। মাঝে-মাঝে চিঠিপত্রের মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত তাঁহাকে যতটুকু পাই, তাহাতে আমাদের পেট ভরে না। আমাদের আশঙ্কা হয়, সেদিক দিয়া আমাদের ক্ষুধা অতৃপ্তই থাকিয়া যাইবে।

তবে আর একটা মোটা হিসাব খতাইয়া তাঁহাকে কতকটা পাইতে পারি—তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে। তাঁহার মত এত বেশি রচনা পৃথিবীতে আর কোনও একজন ব্যক্তি করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। দুঃখের বিষয়, গোড়ার দিকের অধিকাংশ রচনাই তিনি অনামে বা বেনামে প্রকাশ

করিয়াছিলেন ; সেই নাম-না-থাকা কাঁচা লেখাগুলিকে তিনি যে আজ নামের আশ্রয় দান করিবেন, সেরূপ ভাবও তাঁহার নাই। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁহার বাল্য ও কৈশোরের রচনাগুলি নিশ্চিহ্ন করার কাজে লাগিয়াছেন—তিনি ভুলিয়া যাইতেছেন. কাঁথার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াই আমরা ধুতির গৌরব অর্জন করি এবং সেই কাঁথাও যে বর্জনীয় নয়, গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন একেবারে যৌবনে প্রস্ফুটিত হইয়াই দীপ্যমান থাকিতে চান, তখন আমরা নালিশ করিলেও কোনই ফল হইবে না। তথাপি আমরা তাঁহাকে বুঝিবার জন্য তাঁহার সেই পুরাতন অস্বীকৃত রচনাগুলি হইতে শুরু করিতে চাই। অনুসন্ধিৎসু জন এগুলি খুঁজিয়া পাঠ করিলেই দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে পারিবেন, রবীন্দ্রনাথের মনের জটিলতা এগুলির সাহায্যে কিঞ্চিৎ সরল হইবে। আমার একটা ভরসা এই যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সাহায্য না পাইলেও প্রশ্ন করিয়া তাঁহার জবাবের সাহায্যে সঠিক সংবাদ পাইতে পারিব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে তাঁহার শৈশবের কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনার টুকরা, স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; সেগুলি সম্বন্ধে তিনিই প্রমাণ। সেগুলির পুনরুল্লেখ করিব না। যে সকল রচনার কথা তিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উল্লেখ করেন নাই, যেগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন অথচ নমুনা দেন নাই, অথবা যেগুলি তাঁহার লেখা বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইয়াছে, তাঁহার নিতান্ত শৈশব ও কৈশোরের সেই সকল রচনার কথা সংক্ষেপে বলিব। যে সকল লেখার উল্লেখ পাওয়া যায় অথচ লেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে, অনাবশ্যকবোধে সেগুলির আলোচনা পরিত্যক্ত হইবে। পরবর্তী কালেও নানা সাময়িক-পত্রে বিক্ষিপ্ত তাঁহার অনেকগুলি রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। বিশ্বভারতীগ্রন্থপ্রকাশমণ্ডলী সেগুলির দায়িত্ব লইয়াছেন। এই "রচনাপঞ্জী" ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত তাঁহার রচনা লইয়াই।

রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'কবি-কাহিনী' ১৮৭৮ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, বস্তুতঃপক্ষে রচনাপঞ্জীর এলাকা তাহার পূর্বেকার।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫ বৈশাখ ১২৬৮, ১৭৮৩ শক) সোমবার রাত্রি আড়াইটা হইতে তিনটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

১৩১১ বঙ্গাব্দে (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে) হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রকাশিত হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বীয় জীবন-বৃত্তান্তের সামান্য উপকরণ যোগাইয়াছেন (৯৬১-৯৮৬ পৃষ্ঠা), তাহার এক

স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পিতার সহিত যখন তিনি হিমালয়যাত্রা করেন (১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে) তখন ড্যালহৌসি পাহাড়ে অবস্থানকালে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।

"রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাহার বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূত্রপাত।"

'জীবন-স্মৃতি'তে (১ম সংস্করণ, ৬৫ পৃষ্ঠা) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তিনি প্রক্টরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে [অনেক বিষয়] মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।"

দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম রচনার কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার ধারণা, ঐ প্রবন্ধ সেই সময়েই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। সেই সময়ের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঘাঁটিয়া দেখিতেছি, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম নয় কল্পে জ্যোতিষ বিষয়ে অন্য কোনও প্রবন্ধ নাই। ১৭৯৫ শকের জ্যৈষ্ঠ মাস ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাস। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহারা ড্যালহৌসি পাহাড়ে ছিলেন। সুতরাং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে এই সুবৃহৎ প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রথম গদ্য প্রবন্ধ—ইহা তাঁহার নামাঙ্কিত প্রথম মুদ্রিত কবিতার ("হিন্দু মেলার উপহার"—অমৃত বাজার পত্রিকা ২৫এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) প্রায় দুই বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন বিচক্ষণ লোকের লেখা বলিয়া বোধ হয়—পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক বহু সিদ্ধান্তও ইহাতে আছে; হইতে পারে, এগুলি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশ। এই প্রবন্ধ প্রকাশের কাল এইরূপ—১। জ্যৈষ্ঠ (১৭৯৫ শক), পৃ. ৩০-৩২; ২। আষাঢ়; পৃ. ৬৪-৬৭; ৩। আশ্বিন, পৃ. ১২৫-১২৮; ৪। কার্তিক, পৃ. ১৪২-১৪৮; ৫। পৌষ, পৃ. ১৮৪-১৮৮; ৬। মাঘ, ২০৪-২০৭। ইহার পরেও "ক্রমশঃ প্রকাশ্য" লিখিত আছে।

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না।

['শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৪৮, ১৩-১৪ পৃষ্ঠার সংযোজন এই :

১৩৪৬ সালের কার্তিক সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র (পৃ. ১৪৭-৪৮) "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"তে জ্যোতিষ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনার উল্লেখ করিয়াছিলাম। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ড্যালহৌসি পাহাড়ে অবস্থানকালে জ্যোতিষ-বিষয়ে নানা কথা পিতার মুখে মুখে শ্রবণ করিয়া বালক রবীন্দ্রনাথ তাহা লিপিবদ্ধ করিতেন এবং প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাংলায় অনুবাদ করিতেন। এই সংবাদ আমরা তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি' ও 'বঙ্গভাষার লেখকে' প্রকাশিত তাঁহার জীবনীতে পাই। এগুলি প্রকাশের কোনও উল্লেখ 'জীবন-স্মৃতি'তে নাই। বরঞ্চ এ পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় (প্রথম সংস্করণ) তিনি ১২৮৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে' (পৃ. ৫৭৩-৫০) প্রকাশিত "ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী" নামক সমালোচনা-প্রবন্ধকেই তাঁহার প্রথম গদ্য-রচনা বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং জ্যোতিষ-বিষয়ে তাঁহার কিছু রচনার খবরও আমরা পাইতেছি। সুতরাং অনুমান করিয়াছিলাম, উক্ত প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তাঁহার ধারণা, উক্ত প্রবন্ধ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ঘাঁটিয়া দেখিয়াছিলাম, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় "ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র" নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের কোনও হাত থাকিলে নিঃসংশয়ে ইহাই ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত তাঁহার সর্বপ্রথম লেখা। কিন্তু প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল, উহা ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোনও বিচক্ষণ লোকের লেখা। সুতরাং আমি তখন প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই। আমার সন্দেহ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ সেই মন্তব্য পাঠ করিয়া স্বয়ং আমাকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে

অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ইতি ১৫।১০।৩৯"

আমাদের মনে হয়, ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।]

ইহার পরেই তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতার স্থান, অবশ্য অনামী কবিতা। ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৪৮-৫০ পৃষ্ঠায় "অভিলাষ" শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা আবিষ্কার করি। লেখকের নাম দেওয়া নাই, কিন্তু উহা যে "দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত" তাহা বলা হইয়াছে। লেখাটি রবীন্দ্রনাথের, তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এখন এটিকেই তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতার সম্মান দিতে হইবে। মুদ্রণকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর সাত মাস, ইহা তাঁহার আরও এক বৎসর পূর্বের রচনা। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেতিহাসে এই কবিতাটির আসন সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক বলিয়া কবিতাটি এখানে সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করিতেছি।—

অভিলাষ

দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচিত

(১)

জন মনো মুগ্ধ কর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

(২)

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

(৩)

চলিল মানব দেখ বিমোহিত হয়ে,
পর্ব্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

(৪)

ছিন্ন ক্ষেত্র, জন-শূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে
শান্তি।

(৫)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে আর এক দল,
লোকারণ্য পথ মাঝে সুখ্যাতি
কিনিতে,
রণ ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্ত্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

(৬)

ঐ দেখ পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

(৭)

কোথায় তোমার অস্ত রে ভুরভিলাষ
"স্বর্ণ অট্টালিকা মাঝে?" তা নয়
তা নয়।
"সুবর্ণ খনির মাঝে অস্ত কি তোমার?"
তা নয় যমের দ্বারে অস্ত আছে তব।

(৮)

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে, মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে
তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

(৯)

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে
তারা
দরিদ্র কুটীর মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

(১০)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বন্ধুর পথেতে
সন্তোষ নাহিক পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্য্যকর আঁধার নরকে।

(১১)

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্ব্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে,
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

(১২)

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ান কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এসব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

(১৩)

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্ব্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা

পবিত্র ধর্ম্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

(১৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

(১৫)

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুত পদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

(১৬)

দেখ দেখ বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

(১৭)

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

(১৮)

দুরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

(১৯)

ঐ দেখ আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্প পরিপূর্ণ শোভন আপন।

(২০)

মনোহর কুঞ্জ-বন সুখের আগার
শিল্প পারিপাট্য যুক্ত প্রমোদ ভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজা পূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

(২১)

ভাবিল মুহূর্ত্ত তরে ভাবিল কৃষক
সকলি এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ঐ বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ঐ শোভন প্রদেশ।

(২২)

মুহূর্ত্তেক পরে তার মুহূর্ত্তেক পরে
লীন হ'ল চিত্রচয় চিত্তপট হোতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
"আছে কি এমন সুখ আমার কপালে?"

(২৩)

"আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষা চয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্ত্তের তরে
কার্য্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়"।

(২৪)

ঐ দেখ ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্ত মাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজ-দণ্ড এবং মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

(২৫)

ঐ দেখ গুপ্ত হত্যা করিয়া গহন
চলিতেছে অঙ্গুলির পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখ।

(২৬)

হত্যা করিতেছে দেখ নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ঐ দেখ ঐ দেখ রক্ত মাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

(২৭)

কিন্তু হায় সুখ লেশ পাবে কি কখন ?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন ?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন ?
সুখ কভু তারে কিগো কটাক্ষ করিবে ?

(২৮)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
দুখ বহু সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে ?

(২৯)

কখনই নয় তাহা কখনই নয়
পাপের কি ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কি শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনই নয় তাহা কখনই নয়।

(৩০)

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাসন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাসন সম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভাল লাগে আর।

(৩১)

নর হত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

(৩২)

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

(৩৩)

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ !
চতুর্দ্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক কাননে।

(৩৪)

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলশ এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙ্গিল হঠাৎ তাহা ভাঙ্গিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

(৩৫)

দুর্যোধন চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডু পুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

(৩৬)

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

(৩৭)

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্ম্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

(৩৮)

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবী মণ্ডলে
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

(৩৯)

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল মাঝে?

ইহার পরেই কালানুক্রমিকভাবে যে কবিতাটির স্থান তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বনামে প্রকাশিত "হিন্দুমেলার উপহার" কবিতা। ১৮৭৫ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পার্সিবাগানে জাতীয় বা হিন্দুমেলার নবম বার্ষিক অধিবেশনে ১৩ বৎসর ৯ মাসের বালক রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্মৃতি হইতে বাইশ স্তবক, অষ্টআশি পংক্তির এই দীর্ঘ কবিতাটি সুললিতকণ্ঠে আবৃত্তি করেন। ইহার আরম্ভ পংক্তি "হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনপরি" এবং শেষ পংক্তি "অনন্ত গভীর কালের জলে।" কবিতাটি ১৮৭৫ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের দ্বিভাষিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ ৫৭ বৎসর পরে উহা উদ্ধার করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ৫৮০-৮১) পুনর্মুদ্রিত করেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে এই কবিতার উল্লেখ নাই।

১৭৯৭ শকাব্দের আষাঢ় সংখ্যা (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ জুন-জুলাই) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "প্রকৃতির খেদ" নামক একটি দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত আছে, লেখকের

নাম নাই। রবীন্দ্র-কাব্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা কবিতাটি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা। কাব্যরসের দিক্ দিয়া কবিতাটি পাসমার্কা পাইবে; একজন চতুর্দশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এরূপ রচনা miracle-পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে। কবিতাটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।—

প্রকৃতির খেদ

বালকের রচিত

বিস্তারিয়া উর্ম্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে॥
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে॥
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে অলকা-রাশি
কবরি কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতি-দেবী গা'ন ধীরে ধীরে।
নলিনী-নয়ন-দ্বয়, প্রশান্ত বিষাদ-ময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে॥—
'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তা'হলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ।
তা হ'লে কি হিমালয়, গর্ব্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার মুকুট শিরে করি পরিধান॥

তা'হ'লে কি শতদলে তোর সরোবর-জলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুম-রাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিতো কিলো অমন সুবাস ॥
তা'হ'লে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করো,
তরু-লতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলন ॥'
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষণ
গলিল তুষার মালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহার বিন্দু নির্ঝরিণী-জলে।
কাঁপিল পাদপ-দল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে ॥
ঈষৎ আঁধার-রাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি
আটক করিল নব অরুণের কর।
মেঘ-রাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্ব্বত-শিখর ॥
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি-সুন্দরী।
'কাঁদ্ কাঁদ্ আরো কাঁদ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হ'ল না হ'ল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হ'ল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেলো দে'না অলঙ্কার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া ভরত-ভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে ॥
উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদ ভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।

দেখ্‌ আর্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্য পটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্‌ সেই তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥
কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে, তাড়ায় আঁধার জালে
কেমন স্বাধীন ভাবে বিস্তারিয়া কর॥
তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা-ঝঙ্কারিত।
শুনিয়া ভারত পাখী, গাইত শাখায় থাকি,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত॥
সে সব স্মরণ করে কাঁদ্‌লো আবার।
আয়্‌ রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর্‌,
ধূর্জটি! সংহার শিঙ্গা বাজাও তোমার॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলো দেও বায়ু দল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক্‌ ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগর বালুকা রাশি,
মরুভূমি হয়ে যাক্‌ সমস্ত প্রদেশ॥'
বলিতে নারিল আর প্রকৃতি সুন্দরী,
ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে স্তব্ধ হিমগিরি॥
জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গ ভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি সতী আসন উপর।
সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘ গণে,
সুতীব্র রবির ছটা হ'ল বিকীরিত।
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত॥—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।

অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এবিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যে'ত পশু-গণে॥
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ॥
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাশিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল যাইত শুকায়ে—
তপন-কিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ॥
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
না দেখি মনুষ্য মুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মত, আনন্দে দিবস যে'ত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান॥
তা'হ'লে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল॥
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হ'লে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হ'ত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হ'লে ত কারাবাসে
সহিতে হ'ত না শেষে এ ঘোর যাতনা॥
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি-কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায় আনন্দে বিহ্বল প্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না॥
আর্য্যরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হ'ল তোর বন।

হরষে প্রফুল্ল মুখে হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন ॥
ঋষিগণ সমস্বরে অই সাম গান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্য ভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি ॥
সরস্বতী নদী-কূলে, কবিরা হৃদয় খুল্যে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত ॥
সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগর তলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস্ তুই আহা, নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে'না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্তকালের মত, সুখসূর্য্য অস্তগত
ভাগ্য কি অনন্তকাল র'বে এই রূপে ॥
তোর ভাগ্যচক্র-শেষে থামিল কি হেথা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জ্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার ॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ু-দল,
ছিন্নভিন্ন কর্য্যে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর ক্ষি, উগর বালুকারাশি
মরুভূমি হয়্যে যাক্ সমস্ত প্রদেশ ॥'

[শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' চতুর্থ খণ্ডের (১৩৬৩, শ্রাবণ) "সংযোজন ও সংশোধন" অধ্যায়ে ২৫৯ পৃষ্ঠার নিম্নলিখিত সংযোজন মুদ্রিত হইয়াছে—

"'প্রকৃতির খেদ কবিতাটি 'রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন' (শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী')। 'হিন্দুমেলার উপহার' এবং 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা দুইটির ভাবসাদৃশ্যও সংশয়াতীত (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা'—প্রবোধচন্দ্র সেন)। সুখের বিষয়, কবির স্মৃতি ও স্বীকৃতি তথা আভ্যন্তরীণ পরোক্ষ প্রমাণের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিবার প্রয়োজন আর নাই। 'প্রকৃতির খেদ' যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকার এক সংখ্যায় (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ৩) ঠাকুর-বাড়ির 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদ্বজ্জন-সমাগমে'র বিগত অধিবেশনে (১২৮২ বৈশাখ)—"বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর।" তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আসলে চৌদ্দ বৎসর, বারো তেরো বৎসর নয়।"]

[আমাদের সংযোজন : ওই বৎসরের (১২৮২) ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে শিলাইদহ হইতে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে পাইতেছি—

"গুণু দাদা

বিদ্বজ্জনের Card ও রবির কবিতা পাঠাচ্ছি—কর্তামহাশয় [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ] কবিতাটী পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।......

সাপ্তাহিক সমাচারে 'বিদ্বজ্জন সমাগমে'র একটা Graphic description দিয়াছে। তাহা কি দেখ নাই?"

"রবির কবিতা"টি এই "প্রকৃতির খেদ।"]

ইহার পরেই যে মুদ্রিত রচনার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতেছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী নাটকে'র অন্তর্ভুক্ত "জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ-দ্বিগুণ" কবিতাটি। কবিতাটি দীর্ঘ, 'সরোজিনী নাটকে'র ষষ্ঠ অঙ্কে

আছে। নাটকটি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নবেম্বর প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের শেষ ফর্মার প্রুফ সংশোধনকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উহা রচিত হইয়াছিল। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি' (ফাল্গুন, ১৩২৬) পুস্তকের ১৪৭ পৃষ্ঠায় আছে :

"রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন—এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না—কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"

সম্পূর্ণ কবিতাটি এই :

জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন !—শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনল শিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।

সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয়লো চিতায় আয়লো সই !
জ্বল্ জ্বল্ চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন ! দেখ্ রে তোরা !
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-কালি ;
জ্বলন্ত-অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥

আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জলন্ত চিতায়,
জলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ!
ভাখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
ভাখ্ রে চন্দ্রমা ভাখ্ রে গগন!

স্বর্গ হ'তে সব ভাখ্ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে।
স্পর্দ্ধিত যবন, তোরাও ভাখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে॥

এই কবিতাটির "ভাখ্ রে জগৎ মেলিয়ে নয়ন",...প্রভৃতি অংশ 'জাতীয় সঙ্গীত। প্রথম ভাগ (National Song Book, Part 1)' পুস্তকে "রাগিনী অহং—তাল একতালা। ইংরেজীসুরে গান করিতে হয়" এই নির্দেশ সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঐ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

কাল-অনুযায়ী ইহার পরেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্বে'র যুগ, এই যুগের বিস্তার মাত্র এক বৎসর—১২৮২ অগ্রহায়ণ হইতে ১২৮৩ কার্তিক, উক্ত-পত্রিকার চতুর্থ বৎসর। এই পত্রিকা সময়মত প্রকাশিত হইলে খ্রীষ্টাব্দ মতে ১৮৭৫ নবেম্বর-ডিসেম্বর হইতে শুরু হইত। কিন্তু বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় দেখিতেছি, ১৮৭৬ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ অগ্রহায়ণ সংখ্যা বাহির হয়। ওই সংখ্যার ১৫-১৭ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "প্রলাপ" কবিতার প্রথম কিস্তি; উহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি যথাক্রমে ফাল্গুন (পৃ ১৯২) ও ১২৮৩ সালের বৈশাখে (পৃ ২৭৮-২৮০) বাহির হয়।

সুতরাং "প্রলাপ" কবিতাটিকে ১৮৭৬ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত বলিয়া ধরিতেছি। তিন কিস্তিতে সম্পূর্ণ কবিতাটি দীর্ঘ; নির্বাচন-যোগ্য অংশ নীচে মুদ্রিত হইল:

প্রলাপ

গিরির উরসে নবীন নির্ঝর,
ছুটে ছুটে অই হ'তেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগলপারা।
হৃদিপ্রাণ খুলে কুলে কুলে কুলে,
প্রলয় কত কি করিছে গান।

হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।
কামিনী পাপড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনী জলে।

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢোলে ঢোলে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।
হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপদলে।
গুণ গুণ গুণ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কি বলে।...
তুই কে লো বালা! বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান।
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া,
অমৃত ললিত করিস গান।
স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুরতান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরাণ,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।
নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃতধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।
মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃতধারা।...
আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।
দেখিব উষার পূরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁঝের লোহিত জলদ-ঘটা।...
ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া—নাচিয়া—বহিয়া যায়।
বসিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সে সব কথা।...
আয় কল্পনা আয়লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে বাতাসে, আকাশে আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।
বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া।
অবাক জগত রহিবে চাহি।...
আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী।
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।...
আয় কল্পনা আয়লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগৎ ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

অগ্রহায়ণ, ১২৮২

"প্রলাপ" দ্বিতীয় কিস্তি—

চাল্! চাল্ চাঁদ! আরো আরো চাল্!
  সুনীল আকাশে রজতধারা!
হৃদয় আজিকে উঠিছে মাতিয়া
  পরাণ হয়েছে পাগলপারা!
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
  জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি!
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
  পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি!···
আয় লো প্রমদা! আয় লো হেথায়
  মানস-আকাশে চাঁদের ধারা!
গোলাপ তুলিয়া পরলো মাথায়
  সাঁঝের গগনে ফুটিবে তারা!···
আয় লো তরুণী! আয় লো হেথায়!
  সেতার ওই যে লুটায় ভূমে
বাজালো ললনে! বাজা একবার
  হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে!

নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে আঙুল!
  নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে তান!
অবাক্ হইয়া মুখপানে তোর
  চাহিয়া রহিব বিভল প্রাণ!
গলার উপরে সঁপি হাতখানি
  বুকের উপরে রাখিয়া মুখ
আদরে অফুটে কত কি যে কথা
  কহিবি পরাণে ঢালিয়া সুখ!···
আয়! আয় বালা! তোরে সাথে লয়ে
  পৃথিবী ছাড়িয়া যাইলো চলে!
চাঁদের কিরণে আকাশে আকাশে
  খেলায়ে বেড়াব মেঘের কোলে!···
যেখানে কাননে শুকায় না ফুল!
  সুরভি পূরিত কুসুমকলি!
মধুর প্রেমেরে দোষে না যেথায়
  সেথায় দুজনে যাইব চলি!

—ফাল্গুন, ১২৮২

"প্রলাপ" তৃতীয় কিস্তি—

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
  বার বার বল কি আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
  হৃদয় পরাণ উঠেছে জ্বলি!
আর বলিব না এই শেষবার
  এই শেষবার বলিয়া লই
মরমের তলে জ্বলেছে আগুন
  হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে সই!
পাষাণে গঠিত সুকুমার ফুল!
  হুতাশনময়ী দামিনী বালা!

অবারিত করি মরমের তল
  কহিব তোরে লো মরম জ্বালা!···
কিছুই চাহিনি পৃথিবীর কাছে—
  প্রেম চেয়েছিনু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হ'ল না পূরণ
  চলিয়া যাইব বিজন বনে!···
তোরে সখি এত বাসিতাম ভাল
  খুলিয়া দেছিনু হৃদয়-তল
সে সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা
  শুধু এক ফোঁটা নয়নজল?···

—বৈশাখ, ১২৮৩

কবি স্বয়ং 'জীবনস্মৃতি'তে এইগুলিকে "গদ্যপ্রলাপ" বলিয়া বিস্মৃতিগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র ও 'প্রভাতসঙ্গীতে'র পূর্বগামিনী ছায়া লক্ষণীয়।

কবির প্রথম নিজস্ব মুদ্রিত গদ্য-প্রবন্ধ এই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' যুগে, এই পত্রিকার ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যায়, ১৮৭৬ সনের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে। বয়স পনের পার হইয়া মাস পাঁচেক হইয়াছে। প্রবন্ধের নাম "ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী।" কবি লিখিয়াছেন:

"আমি তখন ভুবনমোহিনী প্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী বই তিনখানি [ভুবনমোহিনী দেবীর বেনামীতে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'; রাজকৃষ্ণ রায় রচিত 'অবসর সরোজিনী' এবং হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী রচিত 'দুঃখসঙ্গিনী'—তিনটিই কবিতার বই] অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিয়াছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কী, তাহা অপূর্ব বিচক্ষণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। সুবিধার কথা এই ছিল, ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, তাহার মুখ দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেখকটি কেমন, তাহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কত।" —'জীবন-স্মৃতি', "রচনাপ্রকাশ" অধ্যায়

এই প্রবন্ধের কাব্যের লক্ষণ অংশ নিয়ে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। বাকি, কাব্য তিনটি সম্বন্ধে আলোচনা অংশ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল:

"মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সঙ্কেতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি

উর্ব্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্ব্বরা করিতে পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদগীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভার লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালির নির্জ্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়, গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। সেক্ষপীয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয় চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন নিজ হৃদয় চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয় চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পরহৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জ্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লেখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীন কালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীন কালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে

গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookhও Lyric Poetry, Irish Melodiesও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতিকাব্য বলিতেছি। বাঙ্গলা দেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে, আবার বাঙ্গলার জলবায়ুর গুণে বাঙ্গালীরা স্বভাবতঃ নিৰ্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথায়? অনেকদিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত, যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙ্গালীর হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ অষ্টেপৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেম-প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বীতা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে, যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি কমিয়া মহাকাব্য বাহির করেন কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি, জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধ হৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন এই নিমিত্ত মেঘনাদ বধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙ্গালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই

বাঙ্গালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে।"

[রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম গদ্যপ্রবন্ধে দুইটি বস্তু লক্ষণীয়। এক, সতের বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের পথে আমেদাবাদ যাইবার পূর্বে তিনি ইংরেজী জানিতেন না—এই উক্তি সত্য নহে। রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয় চৌধুরীর কৃপায় ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই প্রবন্ধে আছে। তিনি যে 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ায় বাধা ঘটিত না। অল্পস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু খাড়া করিয়া আমার বেশ এক রকম চলিয়া যাইত।" উপরের প্রবন্ধ মহাকাব্য, Lyric Poetry ও শেক্সপীয়ার, বায়রন, মুর সম্বন্ধে সেই "একটা-কিছু খাড়া" করার ফল। দ্বিতীয়, ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে (১৮৭৭ সনের জুলাই) 'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপর যে ধারাবাহিক আক্রমণ কিশোর রবীন্দ্রনাথ চালাইয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত বীজাকারে এই প্রথম প্রবন্ধেই আছে।]

'ভারতী' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে ১৮৭৭ সনের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ সাহিত্যপ্রবীণদের সম্মুখে হিন্দুমেলায় যে কবিতাটি পাঠ করিয়াছিলেন সেইটির একটি রূপান্তরিত মুদ্রিত রূপ শ্রীযতিনাথ ঘোষের ইঙ্গিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী নাটকে'র (১৮৮২ খ্রীঃ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের একটি স্বগত উক্তির মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দু-মেলার উক্ত কবিতাটির যে অস্পষ্ট স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের ছিল শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শুভ-সিংহের স্বগত কবিতাটির ভাবও হুবহু সেই—শুধু "ব্রিটিশ"-এর স্থলে নাটকের প্রয়োজনে "মোগল" বসানো হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখাইতে তিনি ঐটিকে তাঁহার হিন্দুমেলার সেই বিলুপ্ত কবিতা বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। কবিতাটি ঐতিহাসিক, সুতরাং নিম্নে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।—

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!

শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জ্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কূলে, আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয় গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয় ভারত গাইছে মোগলের জয়,
বিষন্ন নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন ?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান ?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান ?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি ?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
কুমারিকা হতে হিমালয় গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা !
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়-ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা !
মোগল রাজের মহিমা গাহিয়া !
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, মোগল-চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর !

হায়ে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
মোগল রাজের বিজয় রবে ?
মোগল বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

'ভারতী' যুগে আসিবার পূর্বে 'ভারতী'-প্রকাশের পরে ('ভারতী'র প্রকাশ জুলাই, ১৮৭৭) ১৮৭৮ সনের ৩০ আগস্ট তারিখে 'জাতীয় সঙ্গীত। প্রথম ভাগ' দ্বিতীয় সংস্করণে মুদ্রিত চারিটি জাতীয় সঙ্গীত বা কবিতার কথা সারিয়া লইতেছি। ওই পুস্তকের ১৮৭৬ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে রচনা চারিটি ছিল না। তাই অনুমান হয় এইগুলি ১৮৭৬ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮৭৮ আগস্টের মধ্যে রচিত। শেষের তারিখে রবীন্দ্রনাথের বয়স সবে সতের উত্তীর্ণ হইয়াছে। জাতীয় সঙ্গীতগুলি পর পর এই—

১। ঢাকোরে মুখ, চন্দ্রমা! জলদে···

ইহা 'রবিচ্ছায়া'র "জাতীয় সঙ্গীত" বিভাগের ১৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'রবিচ্ছায়া' ১৮৮৫ সনে বাহির হয়।

২। তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ···

ইহা 'রবিচ্ছায়া'তে (পৃঃ ১৬০) মুদ্রিত এবং পরবর্তী গানের বহিগুলিতেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আসলে ইহা 'ভারতী' যুগের অন্তর্ভুক্ত; ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতী'তে (পৃঃ ১৪৪) ইহা "উৎসর্গ-গীতি" নামে বাহির হয়।

৩। অয়ি বিষাদিনী বীণা···

৪। ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি···

শেষের দুইটি কবিতা যে রবীন্দ্রনাথের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন, অন্য প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। 'ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী', ২য় সং ১৮৮৬, পৃ. ৪৩-৪৪, 'সঙ্গীত-কোষ', ২য় সং ১৩০৬, পৃ. ৯৯১ 'জাতীয়-সঙ্গীত' প্রভৃতি সঙ্গীত-সংগ্রহ-গ্রন্থে এইগুলি তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া বাহিরও হইয়াছে। সুতরাং এই দুইটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

অয়ি বিষাদিনি বীণা আয় সখি,
গা লো সেই সব পুরাণো গান
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে,
ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ!
হারে হত বিধি মনে পড়ে তোর
সেই এক দিন ছিল,—
আমি আর্য্যলক্ষ্মী, এই হিমালয়ে
এই বিনোদিনী বীণা করে লোয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া—
জগৎ চমকি উঠিয়াছিল!
আমি অর্জ্জুনেরে, আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন দান,
এই কোলে বসি বাল্মীকি কোরেছে
পুণ্য রামায়ণ গান!
আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া
একটি সন্তান উঠেরে জাগিয়া
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি!
হায়রে বিধাতা জানে না তাহারা
সেদিন গিয়াছে চলি
যেদিন মুছিতে বিন্দু অশ্রুধার
কত না করিত সন্তান আমার
কত না শোণিত দিতরে ঢালি।

৪। রাগিণী ভৈরবী

ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু-রাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি,
তত দিন তুই কাঁদ রে!

এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ,
প্রাচীন হিন্দুর কীর্ত্তি-ইতিহাস,
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে
অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
তত দিন তুই কাঁদ্ রে।
যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া
সে দিন ত আর আসিবে না,
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া
সে আর পূরবে উঠিবে না।
এমনি সকল নীচ হীন প্রাণ
জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ
তোমার তরে দেয় না ঢালি।
যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত
সে দিন যখন গিয়াছে চলি
তখন ভারত কাঁদ্‌রে।
তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে
রেখেছ সাজায়ে ভারত-কায় ?
ভারতের বনে পাখী গায় গান,
স্বর্ণ মেঘ-মাখা ভারত বিমান,
হেথাকার লতা ফুলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণ-শস্যময়ী হেথাকার ধরা,
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।
কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি,
রোগ-শুষ্ক মুখে হাসি রাশি ভরি,
রূপের গরব করিস্ হায়,
যে দিন গিয়াছে সেত ফিরিবে না
তবে রে ভারত কাঁদ্‌রে।
ভারত তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া,
শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া,

আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব,
বিজনে বিষাদে বীণা বজাবিব,
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই
তখন ভারত কাঁদয়ে !

এই সঙ্গেই 'সঞ্জীবনী-সভা'র সুবিখ্যাত গান "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি"র উল্লেখ করিতে হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটকে'র (পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক) অন্তর্ভুক্ত হইলেও গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বহু আলোচনা করিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ দেখাইয়া তাঁহাকে দিয়াই তাহা কবুল করাইয়া লইয়াছি। গানটি এই—

খাম্বাজ—একতালা

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইব না ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু সুদৃঢ় বন্ধন।
তা হলে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম নাটকে' সর্বপ্রথম মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" গানটির প্রকাশকাল লইয়া ভুল কোথাও কোথাও এখনও চলিতেছে। এই ভুলের উৎস আমিই। ১৩৪৬, অগ্রহায়ণ 'শনিবারের চিঠি'র ৩০৪ পৃষ্ঠায় আমি ভ্রমক্রমে 'পুরুবিক্রমে'র ১ম সংস্করণে (শকাব্দ ১৭৯৬, ১৮৭৪ খ্রীঃ) গানটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল মনে করিয়া ইহাকে রবীন্দ্রনাথের বেনামী মুদ্রিত রচনার সর্বপ্রথম গৌরব দান করিয়াছিলাম। পরে জানিতে পারি ইহা 'পুরুবিক্রম নাটকে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (শকাব্দ ১৮০১, ১৮৭৯ খ্রীঃ) প্রথম মুদ্রিত হয়, প্রথম সংস্করণে নহে। কাজেই প্রকাশকাল ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৯—পাঁচ বৎসর পিছাইয়া যায়। আমার অনবধানতার জন্ত

অনেকেই ভুল করিয়া বলিয়াছেন। খুব সম্ভব ১৮৭৭ সনে 'সঞ্জীবনী-সভা' প্রতিষ্ঠার কালে গানটি রচিত হয় এবং পরে 'পুরুবিক্রম নাটক'ভুক্ত হয়।]

'ভারতী'র যুগ

১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে আরম্ভ হইয়া অর্ধশতাব্দীরও উর্ধ্বকাল 'ভারতী'-যুগ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ইহার প্রথম সাত বৎসরেই (১২৮৪-৯০) রবীন্দ্রনাথ স্বনামে ও বেনামে ইহাতে অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা লিখিয়া হাত পাকাইয়াছিলেন, এমন বিষয় ছিল না যাহা লইয়া প্রবন্ধ রচনা করেন নাই। ইহার মধ্যে অনেক রচনা তাঁহার গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে, অনেক রচনা পরিত্যক্ত। প্রথম বৎসরের 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'কবি-কাহিনী' ভানুসিংহের সাতটি পদ, 'শৈশবসঙ্গীতে' প্রকাশিত "ছিন্নলতিকা" ও "ভারতী-বন্দনা" এবং গান—"তোমারি তরে মা সঁপিনু"—গ্রন্থভুক্ত হইবার মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া "মেঘনাদ বধ কাব্য" সমালোচনা শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন—ছয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ হয়। এই প্রবন্ধটি নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে। "করুণা" উপন্যাস ১২৮৪ সালের আশ্বিন হইতে ১২৮৫ ভাদ্র পর্যন্ত ১০ কিস্তিতে ২৭ পরিচ্ছেদ বাহির হইয়াও শেষ হয় নাই। ইহাই তাঁহার উপন্যাসের প্রথম হাতে খড়ি। ইহার ভাষা ও ভঙ্গি নিম্নে উদ্ধৃত 'ভিখারিণী'র অনুরূপ, সুতরাং নমুনা দিলাম না।

প্রথম বৎসরের 'ভারতী'র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা 'ভিখারিণী,' রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মুদ্রিত গল্প। ইহা ১২৮৪ সালের শ্রাবণ ও ভাদ্র (১ম ও ২য়) সংখ্যায় দুই কিস্তিতে যথাক্রমে ৩৫-৪২ ও ৭৯-৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়। এই রচনাটি অতীব দুষ্প্রাপ্য বলিয়া 'ভারতী'র পৃষ্ঠা হইতে এখানে সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিলাম।

ভিখারিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী, জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপ ঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি দুইটি শীর্ণকায়, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটীরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া, এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্রগুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলটপালট করিয়া নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূরব্যাপী, নিস্তরঙ্গ সরসী, লাজুক উষার রক্তরাগে, প্রখর হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তর-বিন্যস্ত মেঘ-মালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্নাধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘন-বৃক্ষবেষ্টিত অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে! দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউ-কথাকও মর্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়ই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রামশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত, বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত, শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদ-মালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমল দুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ বর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুল স্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দ্দান্ত রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত, দশমবর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণ-নেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপ-কাহিনী শুনিয়া পক্ষ্ম-রেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড় অভিমানিনী ছিল, কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত, অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত; পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না, কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল, আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটীর অভিমান, সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্রান্ত লোক ছিলেন, রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্ত করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, এবং সম্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিত-সিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত, এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয় কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভাল নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল, ক্রমে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল, ক্রমে তাঁহার প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক্ জীবন রক্ষারও কোন সম্বল নাই, আদরিণী কন্যাটি কি করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোন মতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আর দুই এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে, অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কত কি সুখের কাহিনী শুনাইত; বড় হইলে দুই জনে ঐ শৈল-শিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপি চুপি গম্ভীরভাবে তাহারি পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক-বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈল-শিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে।

অমর সিংহ কহিতেছেন, "কমল! আমিত চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে?" বালিকা ছলছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। "দেখ, কমল, এই অস্তমান সূর্য্য আবার কাল উঠিবে কিন্তু তোর কুটীর-দ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না, তবে বল্ দেখি আর কাহার সহিত খেলা করিবি?" কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। অমর কহিল— "সখি! যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে,"—কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল "আমি যে তোমাকে ভালবাসি অমর, তুমি মরিবে কেন?" অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল "কমল, আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আজ এই শেষ বার তোকে কুটীরে পৌছাইয়া দিই।" দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া কুটীরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিত ভাবে একটির পর আর একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটীরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল, গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে! অমর দেখিল, কমলদেবীর লতাপাতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে, ভাবিল ঐ কুটীরে হয়ত এতক্ষণে শূন্য-হৃদয়া মর্ম্মপীড়িতা বালিকাটি উপাধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল। অজিতসিংহ কহিলেন "রাজপুত বালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস্!" অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে, গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা, শৈলশিখর, কুটীর, বন, নির্ঝর হ্রদ, শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল

আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষ সকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান ; দারুণ তীব্র শীতে হিমালয় গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, এই শীত-সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া একটি ম্লান মুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, তুষারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে, হতভাগিনী কমল করুণ নেত্রে এক এক বার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে, কি বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রু-সলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষার-স্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে। কুটীরে রুগ্না মাতা অনাহারে শয্যাগত, সমস্ত দিন বালিকা এক মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারো কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই, বালিকা কখন ভিক্ষা করে নাই, কি করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কি বলিতে হয় জানে না ; আলুলিত কুন্তলরাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখখানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহ-খানি দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল, নিরাশ বালিকা ভগ্ন হৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে ; কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না, অনাহারে দুর্ব্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথ-প্রান্তে তুষার-শয্যায় শুইয়া পড়িল, শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল, বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে, মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যোড় হস্তে কহিল "মা ভগবতি, আমাকে মারিয়া ফেলিও না, আমাকে রক্ষা কর, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে!" ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল, কমল আলুলিত কুন্তলে, শিথিল অঞ্চলে তুষারে অর্দ্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মত পথ-প্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে, এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে একজন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, বরফ জমিতে লাগিল, বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কমলের মাতা ভগ্ন কুটীরে রোগশয্যায় শয়ান, জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন; গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই, কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে এখনো ফিরিয়া আসে নাই, ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদ-শব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই, কত কি আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন, অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন, "আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন? কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র-বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না, সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কি করিয়া বাঁচিবে?" উঠিতে পারেন না অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক জন প্রতিবাসী, বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল, বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া সজল নয়নে কাতর ভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথ-হারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একবার তাহাকে খুঁজিতে যাও!" তাহারা কহিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।" বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "একবার যাও, আমি অনাথ দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কি দিব বল। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন!" কেহ শুনিল না, সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে? সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নির্জীব ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল, বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন "কমল, মা, আইলি?" একজন বাহির হইতে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ঘরে কে আছে?" গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ* হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং

* পার্বত্য লোক চীড় বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে

কমলের মাতাকে কি কহিল, শুনিবামাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে তুষার-ক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতনলাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্তত: বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ; সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোক-দীপ্ত কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার, কৃপাণ, প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতকগুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল। আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে তুই?" কমল ভীতি-কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল "আমি কমল!" সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল "আজ সন্ধ্যার দুর্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন?" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই"—সকলে হাসিয়া উঠিল, তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, দস্যুদের হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল, সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও!" আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি জানিয়া লইল, অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি সে যদি নির্দ্ধারিত অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।" কমল কাঁদিয়া কহিল "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি অতি দরিদ্র; তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে মারিও না, আমাকে মারিও না, আমি কাহারো কিছু করি নাই।" আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কমলের মাতার নিকট একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার

কন্যা বন্দিনী হইয়াছে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব, যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পার তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়? একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলঙ্কার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন, তথাপি নির্দ্দিষ্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই, অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই বা হউক, কখন সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন, মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে, কিন্তু অশ্রুময়-নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন। সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার বুকের এক একখানি অস্থিও ভাঙিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না। অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন যায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে, আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে। কিন্তু অর্থ পাইলেন না. ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল, তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না, অমরসিংহ যদিও বালক কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়, দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত; এই অন্ধকার কারাগৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশ ভাবে ব্যবহার করিত না, সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোন কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যুপতির পুত্র, সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোন আপত্তি

আছে ? এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরু কমল কোন কথারই উত্তর দিত না। একদিন গেল, ও দুই দিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এদিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল, অর্থ কোথায় ? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সকলি দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন "আমার আর কিছুই নাই, যাহা কিছু ছিল সকলি দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমার কমলকে আনিয়া দেও।" দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিয়া কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দ্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে, তবে চলিলাম, আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নর-শোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।" বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণ-হৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন "যাইও না, আর একটু অপেক্ষা কর, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোহনলালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন "একি অপূর্ব ব্যাপার। এতদিনের পর দরিদ্রের কুটীরে যে পদার্পণ হইল ?"

বিধবা।—"উপহাস করিও না, আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

মোহন।—"কি হইয়াছে ?" বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন "তা আমাকে কি করিতে হইবে ?"

বিধবা "কমলের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

মোহন—"কেন, অমর সিংহ এখানে নাই?" বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না কর, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন—"আচ্ছা, তবে তোমাকে একটি কথা বলি! কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর ত কোন আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কি করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মত আমার অবস্থা নহে।"

বিধবা "অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন, যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারো সহিত কিছু কথা হয় নাই। এদিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন "মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন—"রোস, কাজ সারিয়া ফেলি।" অবশেষে যদি বিধবা, বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কিনা সন্দেহস্থল। বিধবা মোহনলালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ত্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার বাহুপাশে মুখখানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল। কিন্তু অভাগিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল, যুদ্ধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিত সিংহ হত ও অমর কারাবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কন্যাকে এ সংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল। মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র

নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত ; কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ-স্নেহচ্ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দুমাত্র অশ্রু নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভৎসনার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শৈল-শিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষার-দর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, সৈনিক বেশে অমর সিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথায়?" শুনিলেন স্বামীর আলয়ে। মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কি আশা করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন ; যুদ্ধের উন্মত্ত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধনীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন ; তিনি যখন অতর্কিত ভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন, তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈলশিখরের উপর বসিয়া কমলকে যুদ্ধ গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুম-কুঞ্জে সমস্ত জীবন সুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল একদিন বকুল বনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতেই শূন্য মনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর একদিন সে বাল্যকালের খেলেনাগুলি বাহির করিয়াছিল, আর খেলিতে পারিল না, নিরাশায় নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেগুলি তুলিয়া রাখিল ; অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে তবে আবার দুইজনে মালা গাঁথিবে, আবার দুইজনে খেলা করিবে। কতকাল তাহার বাল্য-সখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্মপীড়িতা কমল এক একবার

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক একদিন রাত্রিকালে গৃহে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়া-স্থল সেই শৈল-শিখরের উপর গিয়া দেখিত, ম্লান-বদনা বালিকা অসংখ্য তারা-খচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলিত কেশে শুইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য অমরের জন্য কাঁদিত বলিয়া মোহন বড়ই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, দিনকতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক, তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।

মাতৃ-ভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথ-বায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন-শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা একদিনও জানিতে পারেন নাই। একদিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কতদিনকার কত কি ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখখানি মনে পড়িল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈল-শিখরের উপরে, সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল ঊষা অস্ফুট স্বপ্নের মত তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন, সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহ তাঁহার মর্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না, অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায়, তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকা-তাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়, একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুল-কুঞ্জের পত্র মর্মরিত করিয়া বিষাদের গম্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর-নির্ঝরের মৃদু ঝিরঝির ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু-হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্মভেদী একতানবাহী যে একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে তাহাই শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, অন্ধকারের সমুদ্র-তলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে,

দূরস্থ শ্মশান-ক্ষেত্রে দুই-একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্যন্ত নীরন্ধ্র স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার। সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল "ভাই অমর"—এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিলেন কমল। মুহূর্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল "ভাই অমর"—অচল-হৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রুবিন্দু বিসর্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কি কথা বলিল, অমর কমলকে দুই একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্ল-হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেইরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কমল ভাবিয়াছিল, সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল, কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্মের গভীরতলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্য কর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পরদিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল; অভিমানী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এতদিনের পর সে বাল্য-সখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল? কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছু কাল রাজ-সভার আড়ম্বর-রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণ-কুটীর-বাসিনী ভিখারিণী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কি আছে? এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণ-রেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে, তাঁহাকে ভালবাসিব কোন্ অধিকারে, আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব? সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈল-শিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কি ভাবিতে থাকে,

তাহার মর্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল, পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই, তথাপি ঐ মর্মে লুক্কায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল। বালিকা আর কাহারো সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভাবিত, কাহারো সহিত মিশিত না, হাসিত না, কাঁদিত না; এক একদিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত, পথ-প্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীন-হীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্ব্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আর উঠিতে পারে না, বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত, দেখিত, দূর শৈল-শিখরের উপর বকুল-পত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত, রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক স্বরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আর কোন বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে, মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই।

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য-সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে, চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই, এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে তাহারা কমলকে একবার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জ্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে, মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে, শৈল-বাসীরা অনেক দিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র

কুটীর টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে, এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্ততঃ কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হতভাগিনী নিরাশ-হৃদয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল, অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল, বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল। সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনা গেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদ-মস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত বসন হইতে বারি-বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণশয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্য গম্ভীর মূর্তি অমর সিংহ! বিহ্বলা বালিকা প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই রুগ্ন শরীরে অত অহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোক-বিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাস-শূন্যবক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শোক-বিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটীরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন। [সমাপ্ত]

উপরে উল্লিখিত রচনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ভারতী'র প্রথম চার বৎসরে মুদ্রিত যে সকল কবিতা ও প্রবন্ধ কোন পুস্তকে স্থান পায় নাই অথবা স্থান পাইয়াও বর্জিত হইয়াছে, তাহার তালিকা ও কোন কোনটির উপর সামান্য টীকা ও মন্তব্য নিয়ে প্রদত্ত হইল। এই তালিকাধৃত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়াছেন :—

ভারতী ১ম বৎসর, ১২৮৪

ভারতী—কবিতা, শ্রাবণ, পৃ. ৩-৪।

হিমালয়—কবিতা, ভাদ্র, পৃ. ৭৬-৭৭।

আগমনী—কবিতা, আশ্বিন, পৃ ১১১-১১৩।

শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস

—কবিতা, কার্তিক, পৃ. ১৫৪-৬।

[এই কবিতাটিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে "ভানু" দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে হয়। পংক্তিচারিটি এই :

"নিশি তুমি! আজ হয়ো না প্রভাত,
ভানুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে। ফেলিয়া আমারে,
মধুর যামিনী যেয়ো না আজ॥"]

কাম্নীর রাণী—প্রবন্ধ, অগ্রহায়ণ, পৃ. ২০০-২০৬।

[১৯৫৭ মে, ১৩৬৭, ২৫ বৈশাখ বিশ্বভারতী এই প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রচার করেন। ১৩৬২, ২২ শ্রাবণ প্রকাশিত 'ইতিহাস' গ্রন্থেও উহা সঙ্কলিত হয়।]

বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব—প্রবন্ধ, মাঘ, পৃ ২৯৬-৩০০।

বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য—প্রবন্ধ, মাঘ, পৃ. ৩০৪-৩১০।

সম্পাদকের বৈঠক—অনুবাদ কবিতা, মাঘ, পৃ. ৩২৫-৩৩১।

[কুমারসম্ভব কাব্যের রবীন্দ্রনাথকৃত তৃতীয় সর্গের অনুবাদ ("মদনভস্ম") এই বৈঠকে মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও এবং ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'র ৩১৩ পৃষ্ঠায় ("রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"তে) আমি তাহা প্রচার করা সত্ত্বেও ১৩৪০ সালের বৈশাখের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে ওই একই অংশ (অনেক ছাড় এবং বিকৃত ও নিকৃষ্ট পাঠ সহ) পুনর্মুদ্রিত করিয়া কেন যে গোলমাল তোলা হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই। মাত্র ৪৩-সংখ্যক শ্লোকটি "বৈঠকে" সঙ্গতকারণেই বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

"সম্পাদকের বৈঠকে" এই কয়টি অনুবাদ ছিল: ১। শকুন্তলা হইতে "বিচ্ছেদ" ২। Moore হইতে "বিচ্ছেদ" ৩। Burns হইতে "চুম্বন" ৪। Byron হইতে "কষ্টের জীবন" ৫। Moore হইতে "জীবন উৎসর্গ"

৬। Burns হইতে "ললিত-নলিনী" ৭। Mrs. Opie হইতে "বিদায়" ৮। কুমারসম্ভব হইতে "মদনভস্ম" (১৬৭ পংক্তি) এবং ৮। সেক্সপিয়র হইতে "সঙ্গীত"]

সান্ত্বনা—প্রবন্ধ, চৈত্র, পৃ. ৩৯৯-৪০১।

ভারতী ২য় বৎসর, ১২৮৫

সামুদ্রিক জীব—প্রথম প্রস্তাব, কীটাণু, প্রবন্ধ, বৈশাখ, পৃ. ৩১-৩৮।

ইহাই রবীন্দ্রনাথরচিত সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, "প্রথম প্রস্তাব" লেখা থাকিলেও রচনা আর অগ্রসর হয় নাই। প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষার নমুনা দিতেছি :

"এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গিগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয় সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশঃ ঐ কীট একেবারে দুইভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইনফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহারি খণ্ডাংশ হয়ত আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০ লক্ষ ৪৮ সহস্র কীটাণু জন্মলাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু-শরীর হইতে এককোটি ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহারস্থান। ঘণ্টা কতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবন থাকে। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ইনফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখ, যতদিন পরেই হউক না কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শত বৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।"—পৃঃ ৩৭

ইংরাজদিগের আদব-কায়দা—প্রবন্ধ, জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৮-৬৩।

সম্পাদকের বৈঠক—অনুবাদ কবিতা বায়রণ হইতে, আষাঢ়, পৃ. ১৪০-১৪৩।

স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য—কবিতানুবাদসহ, প্রবন্ধ, শ্রাবণ পৃ. ১৭১-১৮৪।

বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য—প্রবন্ধ, ভাদ্র, পৃ. ২০১-২১২।

কবিতাপুস্তক—বঙ্কিমের কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা, ভাদ্র, পৃ. ২৩৪-২৪০।

"বঙ্কিমবাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না—জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ—সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না—বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন—কিছুই না—হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।"—পৃ. ২৩৪।

পিত্রার্কা ও লরা—প্রবন্ধ, কবিতানুবাদসহ, আশ্বিন, পৃ ২৭২-২৭৭।

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ—প্রবন্ধ, পৃ. ২৮৯-২৯৮।

নর্ম্মান্ জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্মান সাহিত্য—প্রবন্ধ, প্রথম প্রস্তাব, পৃ. ৫০৩-৫১২।

[বৈদেশিক সাহিত্যসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপরের প্রবন্ধগুলি এবং 'ভারতী'র তৃতীয় বৎসরে তালিকাভুক্ত প্রথম দুইটি প্রবন্ধ পরবর্তীকালের সাময়িকপত্রে বিশেষ করিয়া শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৈজয়ন্তী' মাসিক-পত্রে (কার্তিক—১৩৪৬—বৈশাখ ১৩৪৭) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে]।

তুকারাম—বৈশাখ ১২৮৫ হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধারাবাহিক এই প্রবন্ধের বৈশাখ-কিস্তিতে পৃ. ২৫-২৬ রবীন্দ্রনাথকৃত তুকারামের অভঙ্গমালার সাতটি অভঙ্গের কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই সাতটি সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ও ৫৭২। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "নব-রত্নমালায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা" শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-অনূদিত এই অভঙ্গগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও রবীন্দ্রনাথকে দিয়া এইগুলি চিহ্নিত করাইয়া লন। 'নব-রত্নমালা'র (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত) পঞ্চম ভাগে "তুকারাম" অধ্যায়ে এইগুলি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। জগদীশবাবু এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"ইহার সাতটি অভঙ্গ (৫৬৬-৫৭২) রবীন্দ্রনাথ নিজের অনুবাদ বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম বার বিলাত গমনের প্রাক্কালে কবি কয়েক মাস সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আহমদাবাদে ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। কবির এই সময়কার প্রায় সব লেখাই দুষ্প্রাপ্য। সেই হিসাবেও এই অনুবাদগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।"

১৩৬২ সালের অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'তে আমার সংযোজন:

"মালতী-পুথির কয়েকটি পাতায় কয়েকটি অভঙ্গের অনুবাদ পাওয়া যায়। 'নব-রত্নমালা'র চিহ্নিত অভঙ্গগুলির সহিত এইগুলির মোটামুটি মিল আছে।

আমি হস্তাক্ষরিত পুস্তকের বাজারে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি হইতে অপহৃত একখানি পুস্তক পাই। তাহারই মধ্যে কোনও অজ্ঞাত পুস্তকের পুস্তনির একটি পৃষ্ঠা লুকায়িত ছিল। সাদা পুস্তনির উপর পেনসিলে লেখা আর একটি অভঙ্গের অনুবাদ ছিল। হস্তাক্ষর নিঃসংশয়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের। 'যথা প্রাপ্তং তথা ছাপিতং' রীত্যনুযায়ী নিম্নে তাহা মুদ্রিত করিলাম।—

অভঙ্গ

সেদিন হেরিবে কবে এ মোর নয়ান
কেবলি মঙ্গল যবে—কেবলি কল্যাণ।
পরমায়ু অবসানে ভেটিব চরণ
টুটিবে সত্বর মোর সকল বন্ধন।
সকল বন্ধন মোর হোক অপহৃত
উতলা হয়েছে দেব তাই মোর চিত।
পদে পদে দেখি আমি করিয়া বিচার
মন-অঙ্গে রহিয়াছে অনন্ত বিকার।
ভয়ে ভীত তাই মোর চকিত পরাণ
সকাতরে চাহি কৃপা, কর পরিত্রাণ।
তুকা ভণে তব কাণে পশিবে এ কথা
দীন-উদ্ধারণ প্রভু, শীঘ্র এস হেথা।
চরণ ধরিয়া ডাকি তোমারে একান্ত
এখনো কি দুঃখ মোর হইবে না অন্ত?"]

ভারতী, তৃতীয় বৎসর, ১২৮৬

নর্ম্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্ম্যান সাহিত্য দ্বিতীয় প্রস্তাব, প্রবন্ধ, কবিতা-অনুবাদসহ, জ্যৈষ্ঠ পৃ. ৪৯-৬০।

চ্যাটার্টন—বালক-কবি—প্রবন্ধ, কবিতা-অনুবাদসহ, "ক্রমশঃ" লেখা আছে, কিন্তু আর বাহির হয় নাই। আষাঢ়, পৃ. ১৩৮-১৪৪।

ভাসিয়ে দে তরী—গান, ভাদ্র, পৃ. ২২৫।

গানটি যদিও তালিকাভুক্ত আছে কিন্তু ইহার ভাষা ও মিল বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়।

বিলাতভ্রমণ—প্রবন্ধ, আশ্বিন, পৃ. ২৭৬-২৮৬।

প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ চলতি ভাষায় ('য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রে'র ভাষায়) লিখিত হইলেও এতদ্‌সম্পর্কে আমি নিঃসংশয় নহি।

সম্পাদকের বৈঠক—অনুবাদ কবিতা, কার্তিক, পৃ. ৩১৭-৩২৩।

Moore, Burns, Chappel, Shelley, Tennyson প্রভৃতি হইতে অনুবাদ।

ভারতী, চতুর্থ বৎসর, ১২৮৭

বাঙালি কবি নয়—প্রবন্ধ, কবিতা-অনুবাদসহ, ভাদ্র, পৃ. ২১৯-২২৯।

এই প্রবন্ধের শেষাংশ বাদ দিয়া 'সমালোচনা' গ্রন্থে "নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি" শিরোনামায় বাহির হইয়াছে।

বাঙালি কবি নয় কেন?—প্রবন্ধ, আশ্বিন, পৃ. ২৫৭-২৭৫।

…"আন্‌ বিষ, মার ছুরী, ঢাল মদ,—এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙালীদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। এক প্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর, তাহা বাঙ্গালা কবিতায় প্রকাশ হয় না। উন্মত্ত আস্ফালন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, 'আর বাঁচি না, আর সহে না, আর পারি না' ভাবের ছট্‌ফটানি, ইহাই ত বাঙ্গালা কবিতার প্রাণ। এমন সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক। বাঙালীর কল্পনা চোখে দেখিতে পায় না, বাঙালীর কল্পনা বিষম স্থূল। তথাপি বাঙালী কবি বলিয়া বড় গর্ব করে।" পৃ. ২৭৪।

শরতে প্রকৃতি—কবিতা, আশ্বিন, পৃ. ২৮৫-২৮৬।

'প্রভাত-সঙ্গীত' প্রথম সংস্করণে পৃ. ৯৫-৯৯ কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বর্জিত।

অকারণ কষ্ট—প্রবন্ধ, অনুবাদ-কবিতাসহ, আশ্বিন, পৃ. ২৮৭-২৯১।

সম্পাদকের বৈঠক (ডাকিনী, ম্যাকবেথ)—অনুবাদ কবিতা, আশ্বিন পৃ. ২৯২-৯৩।

হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে আমেদাবাদ যাত্রা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার বাড়িতে থাকিয়াই লেখাপড়া করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও বাংলা চর্চাই বেশী, ইংরেজী ভাগ অল্প। এই সময়ে প্রবন্ধ, কবিতা ও গান রচনার কাজও দ্রুত অগ্রসর হয় এবং 'তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকা,' 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' এবং 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় সেগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে। 'জীবন-স্মৃতি'র (১ম সং) ৭৭ হইতে ১০৯ পৃষ্ঠায় এই সময়ের ইতিহাস আছে। ৭৭ পৃষ্ঠায় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহায়তায় সম্পূর্ণ 'ম্যাকবেথ' নাটকের তর্জমার কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে [রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে ভ্রমক্রমে "মুখোপাধ্যায়" লিখিয়াছেন এবং ভুলটি বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে] সাক্ষী রাখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহা শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। এই নাটকের পাণ্ডুলিপি কালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পায় নাই। কেবল ডাকিনীদের উক্তির দুইটি পংক্তি রবীন্দ্রনাথের এখনও স্মরণ আছে। তাহা তিনি আমার নিকট আবৃত্তি করিলেন—

বাজ-বিজুলি বৃষ্টিজলে মিলব কখন তিন বোনে —

এই ঘটনাটি ঘটে ১৩৪৬ অগ্রহায়ণে। মাঘ মাসের ১১ই তারিখে যোড়াসাঁকোতে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে যাই। কথায় কথায় তিনি "রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী"র কথা পাড়িলেন এবং রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদের আরও দুইটি পংক্তি তাঁহার স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিলেন—

কালো বেড়াল তিন বার করেছিল চীৎকার।
তিন বার আর একবার সজারুটা ডেকেছিল।

বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদের ডাকিনী-অধ্যায়টি বিলুপ্ত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সূত্র ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ১২৮৭ সালের 'ভারতী'র আশ্বিন সংখ্যায় "সম্পাদকের বৈঠকে" তাহার সন্ধান পাইলাম। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত পংক্তিটি বিকৃত এবং অবনীন্দ্রনাথ-উদ্ধৃত পংক্তি দুইটি অবিকৃত-ভাবেই আছে, সুতরাং সন্দেহের আর অবকাশ নাই।* কৌতূহলী পাঠক 'ভারতী' দেখিবেন, সাধারণ পাঠকের জন্য সেই আশ্চর্য অনুবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :

দৃশ্য। বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা— ঝড় বাদলে আবার কখন
মিলব মোরা তিনটি জনে।

---

* বাল্যে অনূদিত 'ম্যাকবেথে'র ডাকিনী-অধ্যায় যে 'ভারতী'তে বাহির হইয়াছিল 'জীবন-স্মৃতি'র খসড়াতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

২য় ডা— ঝগড়া ঝাঁটি থামবে যখন,
হার জিত সব মিটবে রণে।
৩য় ডা— সাঁঝের আগেই হবে সে ত;
১ম ডা— মিলব কোথায় বোলে দে ত।
২য় ডা— কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা— ম্যাকেথ সেথা আসচে আজ।
১ম ডা— কটা বেড়াল! যাচ্চি ওরে।
২য় ডা-- ঐ বুঝি ব্যাঙ্ ডাকচে মোরে!
৩য় ডা— চল্ তবে চল্ ত্বরা কোরে।...

দৃশ্য। এক প্রান্তর। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডা—মারতেছিলুম শুয়োর গুলি।
৩য় ডা—তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা—দেখ্ একটা মাঝির মেয়ে
গোটা কতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ার মুখী বোল্লে রেগে
"ডাইনি মাগী যা তুই ভেগে।"
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—
নইক আমি এমন মেয়ে!

দৃশ্য—গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিন জন ডাকিনী।

১ম ডা—কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা- তিন বার আর এক বার
সজারুটা ডেকেছিল।
৩য় ডা—হাসি বলে আকাশ তলে
"সময় হোল" "সময় হোল।"
১ম ডা—আয়রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে।
বিষ মাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌রে ছুঁড়ি'।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোড়া
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে—দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জলরে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য়—জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।

গিরিগিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিক্‌টিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব, আর শুওর শোঁয়া
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগবগিয়ে ফোটাই তবে।
পাঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আনুগে যে সেই জ্রণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।

৩য়—মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মড়া, হাঙর ব্যাং।
উষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন-তাতে

* * *

এই রচনা আনুমানিক ১৮৭৩-৭৪ সনের, কবির বয়স তেরর অধিক হইবে না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহার তের বৎসর পরে ম্যাকবেথের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

শিশু—কবিতা, মাঘ, পৃ ৪৫৫-৪৫৬।

৯৬ পংক্তির এই কবিতাটি প্রথম সংস্করণ 'প্রভাতসঙ্গীতে' এবং ৮ লাইন কমাইয়া দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পায়। পরে উহা আরও বর্জিত হইয়া ৫৬ লাইনে সংক্ষিপ্ত হয় ও বর্তমান 'শিশু' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায় (১৯০৯)।

পারিবারিক দাসত্ব- প্রবন্ধ, চৈত্র, পৃ ৫৫৩-৫৬৪।

'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে বাহির হয়। শেষের দিকে কোনও কোনও উগ্র মতামতের দরুন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখক রবীন্দ্রনাথকে পাদটীকায় কঠিন সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে মতান্তরের ফল। সদ্য বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের পরেও সম্পাদকীয় প্রতিবাদ-মন্তব্য যোগ করেন।

এই প্রবন্ধের ভূমিকায় বঙ্গদেশীয় লেখকগণের উপর একটি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যথা:

"সম্প্রতি স্বাধীনতা নামক একটি শব্দ আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু একথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ

স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সে গুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল, আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-কৃষীগণ "স্বাধীনতা" নামক ঐরূপ একটি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ঐ শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে, পত্রে, পুঁথিতে, সভাস্থলে মহা আড়ম্বরপূর্ব্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে, এবং কবিবর মহাকবি, ও সুপ্রসিদ্ধ কত নামক বড় বড় সাহিত্য ঢাকীগণ এই বোল বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি না কি শব্দ মিঠা বাজিতেছে, এবং সেই তালে তালে না কি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলেজ-পুত্তলগণ চমৎ কল টিপিয়া দিলেই তাহারা নাচিয়া উঠেন, এবং নাচা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না। অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা, যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান্ ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন, যে, স্বাধীনতা শব্দ "তাধিনতা" শব্দের অপভ্রংশ নহে, ঐ শব্দটি লইয়া যে কেবল মাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে, ঐ হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবল মাত্র পূজা করিলে কোন প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।' পৃ ৫৫৩। "

কিন্তু প্রবন্ধের মোদ্দা কথাটা হইতেছে এই —

"বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্য ফলে আজ কাল দেশে যে সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-সম্পন্ন আধ-শোণিতবান্ তেজিয়ান্ দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাহারা চীৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তা হয়ত অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা

আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোন কর্ত্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা "হ্যারে" করিয়া উঠিলেই ছেলে পিলে গুলার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।" পৃ ৫৫৫।

পঞ্চম বৎসরের 'ভারতী' হইতে রবীন্দ্রনাথ সাবালক, তাঁহার রচনার মর্যাদা তখন পারিবারিক গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরেও যথেষ্ট ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চম বর্ষ হইতে 'ভারতী'তে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, যাহা মুদ্রিত হয় নাই প্রভাতকুমার তাঁহার 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে সেগুলির ধারাবাহিক উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র "গ্রন্থ-পরিচয়ে" ও "পরিশিষ্টে" শ্রীপুলিনবিহারী সেন যথাসম্ভব পরিত্যক্ত রচনাগুলিকে ব্যবহার করিতেছেন। কাজেই রচনাপঞ্জীর কাজ এখানেই সমাপ্ত করিলাম। 'কবি-কাহিনী' সম্পর্কে একটি চিঠির উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন, কারণ, সেটি সম্পূর্ণ আমার আবিষ্কার। চিঠিটি প্রথম বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী-শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গিনী অ্যানা তড়খড়ের লেখা। ইনিই রবীন্দ্র-কাব্যে প্রভাত-শশির নলিনী, ইঁহার কথা 'ছেলেবেলা'য় এবং অন্যত্র কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী লইয়া কাজ করিতেছিলাম। হঠাৎ মহর্ষির আত্মচরিতের সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত একটি ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থ চোরাবাজার হইতে আমার হস্তগত হয়। তাহার মধ্যেই এই চিঠিখানি সুরক্ষিত ছিল। প্রথমে ভুল করিয়া বসিয়াছিলাম, বইটি সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব কপি তাই চিঠিটি তাঁহাকেই লেখা মনে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে উহা লইয়া গেলাম। চিঠিটি দেখিয়া একেবারে সায়ং-সন্ধ্যায় রবির প্রভাত-দীপ্তি যেন ফিরিয়া আসিল। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া তিনি রথীন্দ্রনাথকে ডাকিলেন এবং চিঠিখানি তাঁহাকে দেখাইয়া এই মাত্র মন্তব্য করিলেন যে, তোমরা রবীন্দ্র-যাদুঘর যদি করিতে চাও, এই পত্রটিকে সর্বাধিক গৌরবের স্থান দিও। পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে পত্রটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে লেখা। তিনিই 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হইলে এক খণ্ড অ্যানাকে পাঠাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিলাত রওয়ানা হওয়ার (২০

সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) পর যে 'কবি-কাহিনী' বাহির হয় পত্রখানি তাহারই প্রমাণ। পত্রটি এই :—

Bombay
65.Kandevadi
Novr. 26th [1878]

Dear Sir,

I have to apologise to you for having kept your kind letter of the 11th inst, with the copy of "কবিকাহিনী" unacknowledged so long, but various causes, in the shape of illness, have combined to hinder me from doing so till the present moment, and even as I write this, I have fever upon me

Thank you very much indeed for sending me the entire publication of "কবিকাহিনী", though I have the poem myself in the numbers of "ভারতী", in which it was first published, and which Mr Tagore was good enough to give me before going away and have had it read and translated to me, till I know the poem almost by heart

You are under a misapprehension when you suppose that I have "learnt" Bengali I *was* only a beginner, for ill-health has come in the way of my studies, and I have had to cease continuing them

Belive me
Yours sincerely
Ana Turkhud

'ভগ্নহৃদয়' (২৩ জুন ১৮৮১) "হে"কে উৎসর্গিত। "হে" কে, কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি মনে হয়? বলিলাম, হেমাঙ্গিনী। 'অলীকবাবু'তে আপনি অলীকবাবু ও কাদম্বরী দেবী হেমাঙ্গিনী সাজিয়াছিলেন। এই নামের আড়ালের সুযোগ আপনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিলেন, ইহাই সত্য, অন্য সব অনুমান মিথ্যা।

কয়েকটি অনুবাদ-কবিতা

১৭৯৮ শকের মাঘ মাসের (৯ম কল্প, ২ ভাগ, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠায় একটি ছোট অনুবাদ-

কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে; অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি আমার নিকট একটি পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিত সাক্ষ্য দিতে পারেন না, তবে ভাষাটা যে তাঁহার সেকেলে ভাষারই মত, তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না; তিনি লেখেন, সেকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঠিক এই জাতীয় "কবিতা লিখিয়ে" আর কেহ ছিলেন না। মূল এবং অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

তারাকদম্বকুসুমাস্তরকীর্য্য দিক্ষু
ক্ষেমায় সর্ব্বজগতাং শকলৈঃ প্রকাশং।
ছিত্তীরপাণ্ডরুচিঃ শশলাঞ্ছনোঽয়'
নীরাজয়ন্ ভুবনভাবনমূর্জ্জিহীতে॥
স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্ সাগরং
প্রগ্রাবৈর্গিরিকন্দরান্ মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভরা' প্রীতিং বিধেহি প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাৎ ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে।

তারকা-কুসুমচয় ছড়ায়ে আকাশময়
চন্দ্রমা আরতি তাঁর করিছে গগনে।
দুলায়ে পাদপগুলি, সাগরে তরঙ্গ তুলি,
জাগাইয়া জগতের জীবজন্তুগণে।
পর্ব্বতকন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর দুলায়।
অগণ্য তারকাবলী চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গলকনকদীপ গগনের গায়॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কৈশোরে ও যৌবনে ইংরেজী ও সংস্কৃত হইতে বহু কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সামান্য কয়েকটি মাত্র তাঁহার 'প্রভাত সঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল', 'শিশু' ও টাকি সংস্করণ কাব্যগ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে। 'ভারতী'র প্রথম কয়েক বৎসরের "সম্পাদকের বৈঠক" বিভাগে তাঁহার অধিকাংশ অনুবাদ-কবিতা স্থান পাইয়াছে, অন্যান্য পত্রিকায় কচিৎ একটি আধটি অনূদিত কবিতা দৃষ্ট হয়। ১২৯১ সালের ভাদ্র মাস হইতে 'আলোচনা' নামক একটি "ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক মাসিক পত্রিকা"

ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন উৎসাহী সভ্যের চেষ্টায় বাহির হইতে থাকে। ইহাতে প্রথম বৎসরে তাঁহার দুইটি অনুবাদ-কবিতা বাহির হইয়াছিল, এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। 'আলোচনা' অতিশয় দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা, সুতরাং আমি কবিতা দুইটি নীচে তুলিয়া দিলাম।

সুখী-প্রাণ। (Robert Buchanan)

জান না ত নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে,
কোথায় যে করিছ প্রয়াণ,
মাতিয়া চলেছ তবু আপন আনন্দে পূর্ণ,
আনন্দ করিছ সবে দান।
বিজন অরণ্য-ভূমি দেখিছে তোমার খেলা,
জুড়াইছে তাহার নয়ান,
মেষ-শাবকের মত তরুদের ছায়ে ছায়ে
রচিয়াছ খেলিবার স্থান।
গম্ভীর ভাবনা কিছু আসে না তোমার কাছে,
দিন রাত্রি গাও শুধু গান।
বুঝি নর-নারী মাঝে এমনি বিমল হিয়া
আছে কেহ তোমারি সমান।
চাহে না চাহে না তারা ধরণীর আড়ম্বর।
সন্তোষে কাটাতে চায় প্রাণ,
নিজের আনন্দ হতে আনন্দ বিতরে তারা
গায় তারা বিশ্বের কল্যাণ।

জীবন-মরণ। (Victor Hugo)

ওরা যায়, এরা করে বাস :
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত না হা-হুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।
আঁধারেতে রয়েছি বসিয়া ;
একই বায়ু যেতেছে শ্বসিয়া
মানুষের মাথার উপরে।
অরণ্যের পল্লবের স্তরে।
যে থাকে সে গেলদের কয়,
"অভাগা কোথায় গেলি হায়।
আর না শুনিবি তুই কথা,
আর না হেরিবি তরু লতা,
চলেছিস্ মাটিতে মিশিতে,
ঘুমাইতে আঁধার নিশীথে।"
যে যায় সে এই ব'লে যায়,

"তোদের কিছুই নাই হায়,
অশ্রুজল সাক্ষী আছে তায়।
সুখ যশ হেথা কোথা আছে
সত্য যা' তা' মৃতদেরি কাছে।
জীব, তোরা ছায়া, তোরা মৃত,
আমরাই জীবন্ত প্রকৃত।"

'মন্ত্রিঅভিষেক'

১২৯৭ সালের বৈশাখের 'ভারতী ও বালকে', লর্ড ক্রসের বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপলক্ষে এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে যে বিরাট সভা আহূত হয় সেখানে পঠিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ উহা ২৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকাকারে বাহির হয়। ১৩৪৬ সনের পৌষ মাসে প্রবন্ধটি তখনকার সময়োপযোগী বিবেচনায় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া কবিকে পত্র লিখি। তিনি জবাবে অনুমতি দিয়া আমাকে যে পত্র লেখেন তাহা রচনাপঞ্জীর পক্ষে মূল্যবান বিবেচনায় এখানে প্রকাশ করিলাম। প্রবন্ধটি মাঘ ১৩৪৬ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। চিঠিটি এই :

"যখন 'মন্ত্রী অভিষেক' প্রবন্ধটি লিখেছিলুম তার পরে এখন কালের প্রকৃতি বদলে গেছে, তাই এ লেখাটি এখনকার মনের মাপে মিলবে না। দুই কালের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম পায়ের শিকল আরো ইঞ্চি কয়েক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলচি দাঁড়ও নয় শিকলও নয় পাখা মেলব অবাধ স্বারাজ্যে। তখন সেই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখ রাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ ছিল আমার ওকালতি সেকালের পরিমিত ভিক্ষার প্রার্থীদের হয়ে। 'আবেদন আর নিবেদনের থালা'কে তখনো আমি অশুচি বলে মেনেচি, এবং তৎকালীন কন্‌গ্রেসের বিনয় দীনতা আমার হাতে ভর্ৎসনা পেয়েছে। এই কথা প্রমাণের জন্য তখনকার সাংবাদিক দলিল থেকে দিন ক্ষণ তারিখের উদ্ধারের ভার রইল তাঁদের 'পরে যাঁরা কাটা ফসলের পুরানো ক্ষেতে উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহে সুদক্ষ।

৫।১।৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"